AC 126
নিজে করো
সম্পাদক
গঙ্গেশ ঘোষ ● মদন মুখোপাধ্যায়
প্রথম খণ্ড

নিজে করো

প্রথম খণ্ড

গঙ্গেশ ঘোষ □ মদন মুখোপাধ্যায়-এর
যৌথ সম্পাদনায়

[প্রথম খণ্ড]

প ত্র ভা র তী ★ PATRA BHARATI
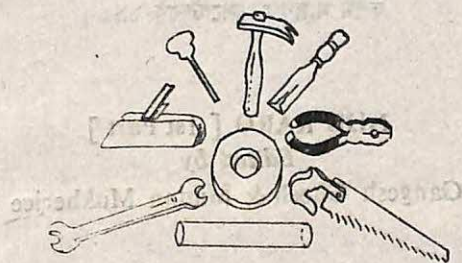
৩/১ কলেজ রো ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৮৩
চতুর্থ মুদ্রণ : মার্চ ১৯৮৪
পঞ্চম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : ষষ্ঠ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
সপ্তম মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৮৭
অষ্টম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
নবম মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯০
দশম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯০

NIJE KARO [1st Part]
Edited by
Gangesh Ghosh & Madan Mukherjee

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অলয় ঘোষাল

মূল্য
দশ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত ॥

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যারা ভালবাসে,

মনেপ্রাণে কামনা করে তার প্রচার ও প্রসার,

সেইসব বন্ধুদের হাতে এ বই তুলে দিলাম।

গঙ্গেশ ঘোষ ● মদন মুখোপাধ্যায়

যে যে বিচিত্র যন্ত্র তৈরির কলাকৌশল এ বইতে আছেঃ

১. ভানুমতীর খেল
২. ইনস্ট্যান্ট কালার টি ভি
৩. ডানা ভাঙ্গা পাখি
৪. এস্পেশাল বাক্স
৫. অটো স্টার্ট রেডিও
৬. এক চুলের জন্যে
৭. অটো লক লেটার বক্স
৮. গ্যাম্বলিং
৯. ক্যালকুলেটর
১০. —দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি!
১১. প্রোজেকটর
১২. আইসক্রীম (ভিডিও গেম্‌স্‌)

এবং

বিজ্ঞানের টুকিটাকি॥

আমাদের কথা

ছেলেবেলা থেকেই আমরা স্বপ্ন দেখতাম, হাতে কলমে নানান জিনিসপত্র তৈরি করার—বিজ্ঞানের নানান যন্ত্রপাতি। বয়স যত বাড়ে, ঝোঁকটাও বেড়ে চলে। বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে পড়তে পড়তে কেবলি মনে হতে লাগলো, আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে কেন? কেন তাদের গিলতে হবে, তিতো কুইনাইনের মত বিজ্ঞানকে? বিজ্ঞান কি আমাদের সবার কাছে মজাদার একটা নেশা হয়ে উঠতে পারে না?

তারই অপ্রতিরোধ্য টানে তৈরি করলাম এক বিজ্ঞান-গোষ্ঠী, যেখানে ছোটবয়েস থেকেই যেকোনো ধরনের ছেলেমেয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপারে কাজ করতে পারে। কিন্তু এখানে আর্থিক সামর্থ্য ছিল সীমিত, প্রচারের গন্ডি ছিল সংকীর্ণ।

তবে কি বৃহত্তরভাবে বিজ্ঞানের প্রচার আর কোনওভাবে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়? এই চিন্তাটাই কাঁটার মত খচখচ করত মনের মধ্যে।

এইসময়ই সাক্ষাৎ দেবদূতের মত আবির্ভূত হলেন আমাদের অতি প্রিয় শম্ভুদা (দীপক রায়)। কিশোর ভারতী পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় 'নিজে করো'র দায়িত্ব নিতে হবে।

এ যেন এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ!

কিন্তু ভয় ধরল, কলম ঠিক চলবে তো? সরস ভঙ্গিতে খেলার জিনিস হিসাবে বিজ্ঞানকে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরতে পারবো তো?

দীপকদা তাতেও হলেন সাথী। প্রতিটি লেখা ঘষামাজা করে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে নিলেন। সাহস বাড়ল, মহাউৎসাহে লিখে চললাম সংখ্যার পর সংখ্যা।

এরপর এলেন বন্ধু ত্রিদিব—বই আকারে বের করতে চান 'নিজে করো'। দারুণ খুশিতে লেগে পড়লাম দুই 'পাগলে'। সব কাজ ফেলে ত্রিদিবও নাম লেখালেন আমাদের দলে। বই বের করতেই হবে।

কিন্তু শুধু উৎসাহ থাকলেই কাজ হয় না, চাই সত্যিকারের প্রেরণা। আর সেইটাই অফুরন্তভাবে যুগিয়ে গেলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এঁদের কাউকেই ধন্যবাদ জানাবার স্পর্ধা আমাদের নেই। সম্পর্কটাও সে স্তরের নয়।

যাঁর কথা না বললে এ বই সম্পূর্ণ হবে না, তিনি হলেন আমার (মদন-এর) মাসীমা ও আমার (গঙ্গেশ-এর) মা। সেই ছোট্টবেলা থেকে অফুরন্ত সাহায্য, প্রেরণা, ভালবাসা সবকিছু দিয়ে আমাদের সবরকম পাগলামিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন তিনি। তাঁর আশীর্বাদ পেলে এ বই ধন্য হবে।

পরিশেষে বলি, খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে বই বের করতে হয়েছে। তাই কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ থাকা অসম্ভব নয় মোটেই। তবে তথ্যগত ভুল যাতে না থাকে, তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

সকলের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, হাতেকলমে এইসব নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে গিয়ে যদি কিছুমাত্র অসুবিধায় পড়তে হয়, তবে পত্র ভারতীর কার্যালয়ে স্বচ্ছন্দে যোগাযোগ করলেই আমরা তার ব্যবস্থা নেব।

এ বই যদি দেশের অগণিত ছেলেমেয়েদের কিছু অংশকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অনুরক্ত করে তোলে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

গঙ্গেশ ঘোষ ● মদন মুখোপাধ্যায়

পর্দা উঠল। যাদুকর ভানুমতী অর্থাৎ ছোড়দা, চ্যাপলিনের কায়দায় দাঁড়িয়ে শুরু করলেন যাদুর খেলা। মঞ্চের একপাশে সহকারী হিসেবে হাজির রয়েছে নন্দুদা।

—এবার আপনারা দেখবেন আজকের প্রধান আকর্ষণ আমার মায়াবী যাদু 'ম্যাজিক ল্যাম্প'!

দর্শক আসনের সামনের সারিতে বসে আছেন—বদমেজাজী রাঙাকাকা, সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই আর আমাদের সব থেকে অপ্রিয় খিটকেল মেজমামা।

আমি তো ভালোমতই জানি, যদি একবার ম্যাজিক ল্যাম্পের ম্যাজিক ধরা পড়ে, তাহলে ওদের মাথায় 'গাঁট্টা' নামক দুষ্প্রাপ্য সার সহযোগে আলুর যে চাষ হবে—তা কেউ রুখতে পারবে না।

ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ম্যাজিসিয়ান ভানুমতী ওরফে ছোড়দার গলা শোনা গেল,—হঠাৎ যদি লোডশেডিং হয় আপনারা কী করেন? নিশ্চয়ই বাতি জ্বালান, কিন্তু আমি তা করি না। আমি আমার মায়াবী যাদুকে কাজে—

ছোড়দা-র কথা শেষ হবার আগেই শোনা যায় রাঙাকাকা-র হুঙ্কার,—ঢের হয়েছে বক্তিমে, পাখা বন্ধ করে গরমে আর ক্যারামতি দেখাতে হবে না। চটপট যাদুর খেলা শেষ কর!

যাদুকর ভানুমতী মিটমিটি হাসলেও তার মনের মধ্যে যে বেশ চাপা ভয় চেপে বসেছে, সেটা আঁচ করতে পারি।

যাদুকর বাক্সে ফুঁ দেন, আলো জ্বলে ওঠে। আবার সহকারী ফুঁ দেন, আলো নিভে যায়।
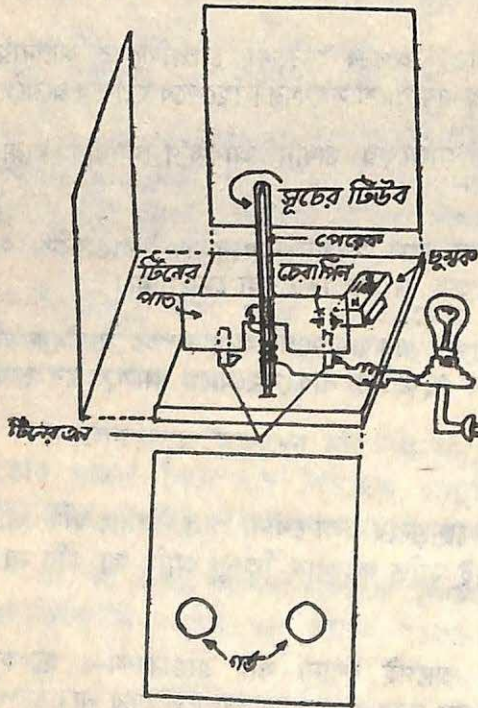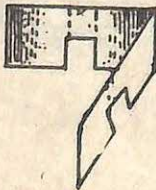
এরপর যা ঘটল, তার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। দুম্ করে অপ্রিয় মেজমামা ভানুমতী অর্থাৎ ছোড়দাকে দশ টাকা দিয়ে বসলেন, সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই ছোড়দা-কে দিলেন একদিনের ছুটি আর রাঙাকাকার প্রতিশ্রুতি রইল শারদীয়া কিশোর ভারতী দেবার।

পুরস্কার সবই যখন ছোড়দা পাচ্ছে তখন নন্দুদা গেল ক্ষেপে। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে শুরু করল রাজনৈতিক নেতার ঢং-এ ভাষণ,—বন্ধুগণ, আজ আপনারা যে ম্যাজিকটি দেখলেন—সেটি আদপেই মায়াবী যাদু নয়, বিজ্ঞানের এক ভ্যাবাচ্যাকা।

নন্দুদার এরপরের কথাগুলো এবার নিজের ভাষায় বলছি, তোমরা কান খাড়া করে শুনে নাও।

একটা তক্তার ওপর, একটা বড় মাপের পেরেক পেছন থেকে মেরে (ছবি নং—১) খাড়া কর। এবার ছুঁচ রাখার কাচের টিউবের খোলা

মুখটা নিচের দিকে করে পেরেকের মধ্যে পরিয়ে দাও। একটা টিনের পাতকে কাচের টিউবের গায়ে বেঁকিয়ে, (ছবি নং—২) একপাশে চেরাপিন দিয়ে পাখার মত লাগাও। এই টিনের পাতটি ফুঁ দিলেই ঘুরবে। টিনের পাতটির একপাশে একটি চুম্বক বসাও (ছবি নং—১)। পাতের দুপাশে তক্তার ওপরে দুটো টিনের 'এল' এমনভাবে সেঁটে দাও, যেন টিনের পাতটি একটি নির্দিষ্ট জায়গার বেশি ঘুরতে না পারে।

মেইন 230 ভোল্ট (V) থেকে আসা তারের একটি প্রান্ত টিনের পাতের গায়ে, আর অন্য একটি তারকে চুম্বকের যে পাশে 'এল' আছে তার সঙ্গে আটকে দাও। 'এল'-এ লাগান তারের অপর প্রান্তটি কিন্তু থাকবে হোল্ডারের এক প্রান্তে--হোল্ডারের অপর প্রান্তটি এরপর সোজা চলে যাবে মেইনে।

কাঠের বাক্সের মধ্যে তক্তায় ফিট করা পুরো জিনিসটা বসিয়ে দিয়ে, ওপর থেকে আরেকটা তক্তা মেরে বাক্সটা বন্ধ করে দাও।

তক্তাটা এমন করে বসাও, যেন টিনের পাতের আড়াআড়ি দিকটা গর্তের সঙ্গে অনুভূমিক থাকে। ডান দিকের গর্তে ফুঁ দিলে টিনের পাতটি ঘুরে চুম্বকের দিকে যাবে। ধাক্কা খেয়ে টিনের পাতটা যাতে ফিরে না যায়, সেজন্য রাখা আছে চুম্বকটি--যা চেরাপিনের মাথাটাকে টেনে রাখবে।

আবার বাঁদিকের গর্তে ফুঁ দিলে পাতটা ঘুরে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে তার লাগান 'এল'-এর সঙ্গে—অমনি অন্ধকার!

একটা কথা বিশেষভাবে মনে রেখ, ভ্যাবাচ্যাকাটা 230 ভোল্ট নিয়ে, তাই সবসময়ই খুব সতর্ক হয়ে কাজ করবে।

নন্দুদার বক্তৃতায় খুশি হয়ে মেজমামা এবার নন্দুদাকে দিলেন কড়কড়ে পাঁচ টাকা, পন্ডিতমশাই দিলেন হাফ-ছুটি আর রাঙাকাকা পিঠ চাপড়ে নন্দুদাকে দিলেন বাহবা।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

এখানে ম্যাজিকের খাতিরে যদিও 230 ভোল্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তোমরা ব্যাটারিও ব্যবহার করতে পার। এতে ১০০ ওয়াটের ল্যাম্পের বদলে ৩ ভোল্ট/৬ ভোল্ট-এর মিনিয়েচার বা টর্চের ল্যাম্প ব্যবহার কোরো।

এপাড়ার ভূতো একাদশ বনাম ওপাড়ার কেলো একাদশের ক্রিকেট টেস্ট। স্থান: বাবলীদের বাগানবাড়ির উঠোন। সময়: সকাল দশটা। দুদিকেই বসেছে উইকেট।

সেজকাকার ল্যাবরেটারির অ্যাপ্রন গায়ে দিয়ে মালীর চুন-খয়া ঘরের দালানে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে ন'দা।

অনেক চোখের জল খরচা করে, বাবার পয়সায় আনা মাইক হাতে আমি ভাষ্যকার—অমল দা। মাউথপিস আমার হাতে। খেলা শুরুর আগে টেস্ট করে নিচ্ছি মাইক্রোফোন...ওয়ান, টু, থ্রি......।

এই পর্যন্ত সবকিছু টিপ্‌টপ্‌, ঠিকঠাক।

ঠিক হয়েছে, যে দল ব্যাট করবে, তারা বসবে মালির ঘরে, থুড়ি প্যাভেলিয়নে! কিন্তু গোল বাধলো ঐ বসা নিয়েই। প্যাভেলিয়নের জানলা মাত্র একটা, তা-ও আবার অ্যাত্তটুকু! বড়জোর দুটো মাথা ঠোকাঠুকি করে খেলা দেখতে পারে। কিন্তু বাকিদের কী হবে? ওরা কি সব অন্ধকার ঘরে সারাক্ষণ মশা মেরে সময় কাটাবে?

ভাবনায় সবার মাথা বনবন করে ঘুরছে। বলা তো যায় না, হয়তো এই ছোট্ট ব্যাপারের জন্যই খেলাটা শেষতক পণ্ড হয়ে যাবে।

ন'দা বলল,—এ্যাত ঝামেলা কিসের? তা হলে তোরা বাইরেই বোস্‌।

তাই বা কী করে হয়, প্লেয়ারদের তো একটা গ্ল্যামার আছে!—দুই একাদশের কপিল-গাভাসকার-আজহারদের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ: কি হয়, কি হয়?

ঘড়ির কাঁটায় এগারটা বেজে গেছে, খেলা শুরুর নামগন্ধ নেই।

সেই মুহূর্তে অতি উৎসাহী সেজকাকার প্রবেশ। দুহাতে দুটো বাক্স। বুঝে নিই, প্লেয়ার পিছু আধা ডিম আর কোয়াটার পাউরুটি এসে গেছে। কিন্তু বাঁ হাতের বাক্সটা......?

—নো চিন্তা, ডু ফূর্তি।

সেজকাকার কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম।

......খেলা শুরু। প্যাভলিয়নের প্রান্ত থেকে ভুতো একাদশের ইমরান খাঁ বল করার জন্য প্রস্তুত।......প্রথম বল, একটু খাটো লেংথের ওপর ছিল! অধিনায়ক কেলো কোনো ঝুঁকি না নিয়ে আস্তে ফরোয়ার্ড খেললেন।......এখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজে। এবার মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি, আমরা ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে......।

মাউথপিসটা পোঁটলার হাতে দিয়েই তড়িঘড়ি ছুটলাম প্যাভেলিয়নে সেজকাকার ক্যারামতি দেখতে।

ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠি,—আরে, এ যে কালার টিভি!

দেখি, সাজঘরের জানলাটা কালো কাপড়ে পুরো ঢাকা। তার মাঝখানে মাপসই কেটে, ইঞ্চি চারেক চৌকোনো কার্ডবোর্ডের বাক্স উঠোনের দিকে মুখ করে বসান (ছবি নং—১)। এর সামনের দিকে আর তলায় 3″ ব্যাসের একটা করে উত্তল লেন্স চারটে ক্ল্যাম্প হোল্ডার দিয়ে বাক্সের মধ্যে সাঁটা রয়েছে (ছবি নং—১—ক)।

দুপাশের দু দেওয়ালে দুটুকরো বাটাম দিয়ে তৈরি খাপে (ছবি নং—১—খ) একটা আয়না 45^0 কোণ করে লাগান। আর, ঠিক বাক্সটার তলায় তিন ফুট আন্দাজ নিচে রাখা আছে, কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো সাদা প্লাস্টিকের একটি চাদর। এটি অনেকটা সিনেমার পর্দার মত—যার ওপর এসে পড়ছে মাঠের ছবি, যেন ইনস্ট্যান্ট কালার টি ভি। (মালির ঘরটা এমনিতেই অন্ধকার, তাই ছবি নং—১-এর মত করে আলাদা কাপড়ে আর ঢাকার প্রয়োজন হয়নি)।

এইরে, ভূতো একাদশ যে ফিল্ডিং করতে মাঠে নেমে পড়েছে।......যদিও পেটে চড়চড়ে খিদে, তবুও......

নমস্কার!......
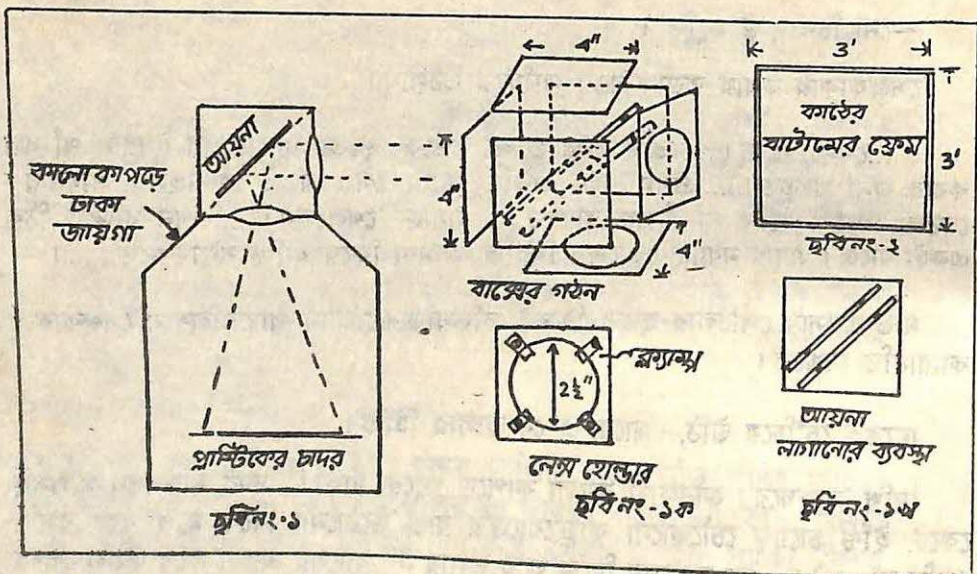
রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

ছবিতে প্রতিটি যন্ত্রাংশ আলাদা করে আঁকা আছে। তবে বাক্সটি প্লাইবোর্ডের করলে ভাল হয়। লেন্স লাগানোর দেওয়ালগুলো থেকে ২½" ব্যাসের মত গোল করে কেটে নিতে হবে। এর ফাঁক দিয়েই বাইরের আলো এসে পড়বে আয়নায়। আয়নার সামনের দিক থাকবে লেন্স দুটোর দিকে। আর, চৌকো বাক্সটার ঠিক নিচে—অনুভূমিকভাবে মাঝবরাবর থাকবে প্লাস্টিকের সাদা চাদরটা।

ফেলুমামার পাখি পোষার ব্যায়রামটা বহুদিনের। মাঝে-মধ্যেই দেখা যেত নতুন নতুন খাঁচা হাতে ফেলুমামা চলেছেন হন্তদন্ত হয়ে। আর খাঁচায় থাকত রংবেরঙের নানান পাখি।

কিন্তু কেন জানি না, ওই সব পাখিদের ফেলুমামা বেশি দিন খাঁচায় ধরে রাখতে পারতেন না। তবে পাখিগুলো উড়ে খাঁচা ছাড়া হত না—হত মরে। টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না কোনটাই আর সয়না। এইসব দেখেশুনে মামা তো তিতিবিরক্ত।

শেষতক বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে ফেলুমামা তৈরি করলেন এক মজার যন্ত্র। আহুত, অনাহুত বাড়ির সব লোকেরই ডাকে এতে সুরেলা কণ্ঠের সাড়া মিলবে। লাভের মধ্যে লাভ, একে ছোলা-দানা খাওয়াবার খরচাও নেই।

এমনি একটি যন্ত্র-পাখি বাড়িতে পুষবে, থুড়ি, রাখবে নাকি ? চট্‌পট্‌ তবে ওই যন্ত্র তৈরির কাজে হাত লাগাও।

যন্ত্রের জন্য যা যা লাগবে তা আগে দেখে নাও।

রোধ ঃ R_1—47K
R_2—1.8K

কনডেন্সার ঃ C_1—2000 μ F/12V
C_2—220 μ F/12V
C_3—.047 μ F/12V

ট্রান্সফরমার ঃ T—আউটপুট ট্রান্সফরমার একটা

ব্যাটারি ঃ 6×1.50 Volt.
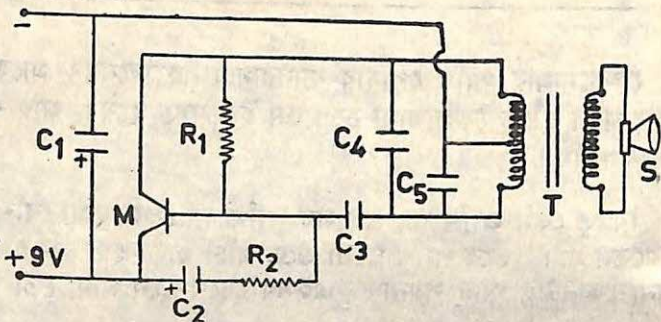
ট্রানজিস্টর ঃ M—AC 128 বা 2SB 77. S —একটা।

স্বইচ ঃ টেপা বা কলিংবেল একটা

স্পীকার ঃ 2" সাইজ 8 Ω ইম্পিডেন্স।

এবারে কাজ আর কিছু নেই। স্রেফ উপরের জলের মতো সোজা সার্কিটটা দেখে পরপর জুড়ে দাও। *ট্রানজিস্টরের এমিটর, বেস ও কালেকটর পয়েন্টগুলি ভালভাবে দেখে নিয়ে সংযোগ করতে হবে। নতুবা সব গড়গড় কিন্তু।

সব কাজ সারা হলে সার্কিটের যেখানে ব্যাটারিতে যোগ করার +9V লেখা আছে ওখানে ঐ পুশ স্বইচে তাদের একপ্রান্ত লাগিয়ে অন্যপ্রান্ত যোগ করো ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্তে। নেগেটিভ প্রান্তে যোগ দেবার তারটা ছবির উপরের দিকেই রয়েছে।

* ট্রানজিস্টর সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের জন্যে 'নিজে করো ঃ ২য় খণ্ড—টুকিটাকি' দ্রষ্টব্য।

পুশ সুইচটাকে দরজার কাছে জায়গামতো বসাও আর তোমার ডানাভাঙ্গা পাখিকে এনে সুন্দর বাক্সে বসিয়ে এমন জায়গায় রাখ যাতে সব জায়গা থেকেই শব্দ পরিস্কার শোনা যায়।

সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল না? যিনি আসছেন তাঁর ডাকে এবার বাক্স-বন্দী ডানাভাঙা পাখিটা, দেখ কেমন সুরেলা কণ্ঠে সাড়া দেয়।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

এক ॥ ব্যাটারি লাগান অবস্থায় ব্যাটারি ক্ল্যাম্পে তার সোলডার করবে না।

দুই ॥ প্ল্যাস্টিক প্লেট বা বাক্সের যেখানে স্পীকারটি বসান হবে, সেখানে কতকগুলো ছোট ছোট গর্ত করে দেবে।

এস্পেশাল বাক্স

টিফিনের সময় একটু নিরিবিলিতে টিফিনের বাক্সটা খুলেই চোখদুটো রাজভোগ হয়ে গেল! আজও ফাঁকা—খাবারের 'খ' অবধি নেই।

না! আর সহ্য করা চলে না। সটান চলে এলুম বৈজ্ঞানিক (?) পাঁচুমামার কাছে। মামা বলে,—ঘাবড়াস নি। জিনিসপত্র যোগাড় কর্। এ্যাক্কেরে এস্পেশাল বানিয়ে দোব।

—তাতে হবেটা কি?

—দেখ্ই না!

পেটের তাগিদে পাঁচুমামার কোচিং-এ শুরু করে দিলাম বাক্স বানাতে।

ঠিক ধরেছি, তোমরাও চিন্তা করছ, টিফিনটা এবার থেকে আমার মত এই বাক্সেই নিয়ে যাবে।

ব্যাপারটা কি জান, বন্ধু যেই বাক্সটা তুলবে তখুনি শক্ খেয়ে গরম তেলেভাজার মত হাত থেকে ফেলে দেবে। আর তুমি সময় মত বাক্স খুলে তোমার প্রিয় খাবার-গুলো তেলেভাজার মত রসিয়ে রসিয়ে খাবে। নাও, তবে বাক্সটা তৈরি করেই ফেল।

প্রথমে একটা লজেন্সের বাক্স (টিনের) যোগাড় কর (৫"×২"×৩" সাইজের হলেই চলবে)। এইবার বাক্সটার ঢাকনা খুলে রেখে ছবি নং ১-এর মত করে ডিবের কিনারা বরাবর সেলোটেপ জড়িয়ে নাও। এটা লাগাবার কারণ, ঢাকনাটা যাতে বাক্সটা থেকে বৈদ্যুতিক ভাবে পৃথক থাকে। যন্ত্রের প্রথম পর্ব শেষ। এবার সার্কিটে হাত দাও। এতে যা যা দরকার তার একটা হিসেব দিই।

ছবি নং ১
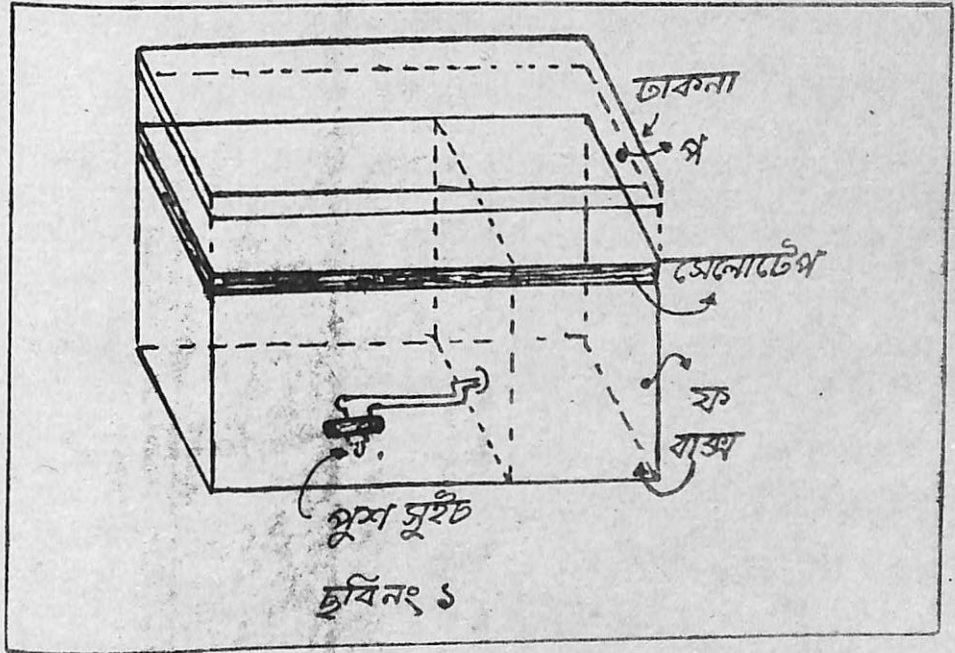
১। ট্রান্সফরমার (T) ঃ স্টেপ ডাউন ফিলামেন্ট ট্রান্সফরমার (বাজারে Centre Tag Eliminator Transformer নামে বিক্রি হয়) মান-Pri 230V, Sec, 6-0-6 V/300 mA;

২। ট্রানজিস্টর (TR) ঃ—Ac 128 বা Ac 188;

৩। রোধ (R) ঃ—দুই কিলো ওহ্মস (2K Ω);

৪। কনডেনসার—(c) ঃ—150 μ fd/15 Vwdc Electrolytic;

৫। পুশ সুইচ (Ps) ঃ—সাধারণ অন্ অবস্থার (NC Type);

৬। ব্যাটারি ঃ—1½ Volt Cell. (1035 বা তার তুল্যাঙ্ক);

৭। বিবিধ ঃ—ব্যাটারী ক্ল্যাম্প, সোল্ডার, তার, স্ক্রু, ইত্যাদি।

প্রথমে ট্রান্সফরমারটির 6-0-6 দিকের যে কোন এক প্রান্তের (ক) পয়েন্ট ট্রানজিস্টারটির (TR) ডট পয়েন্ট সোল্ডার কর। অপর প্রান্তে (গ) রোধটির (R) যে কোন দিক ও কনডেন্সারের (c) নেগেটিভ প্রান্ত যোগ কর (যেমন ছবি নং ২-তে দেখানো হয়েছে)।

কনডেন্সার-এর অপর প্রান্ত রোধের আর এক প্রান্তের সঙ্গে যোগ করে ট্রানজিস্টরের (TR) বেস অর্থাৎ ডট্ পয়েন্টের সবথেকে কাছের তারে সোল্ডার কর।

এবার ট্রানজিস্টরের বাকি পা leg অর্থাৎ এমিটার, সুইচের (Ps) যে কোন প্রান্তে যোগ কর। সুইচের বাকি পোলটি ব্যাটারী ক্ল্যাম্পের পজিটিভ দিকে (চ) এবং ব্যাটারী ক্ল্যাম্পের নেগেটিভ দিক (ছ) ট্রান্সফরমারের (T) খ বিন্দুতে সোল্ডার কর।

ছবি নং-২
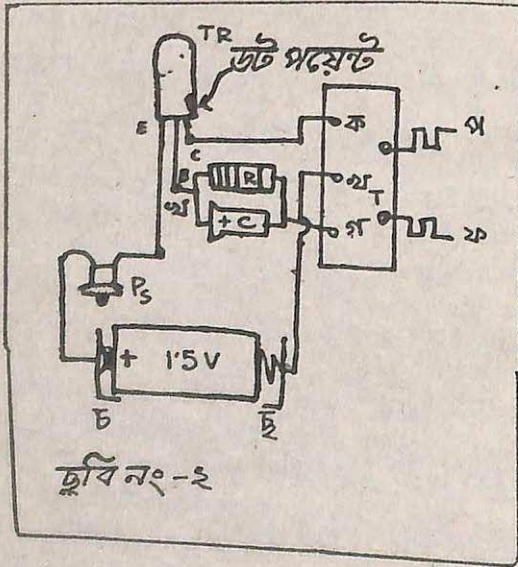
এবারে সার্কিটটা বাক্সে সাবধানে বসাও। সুইচটা বাক্সের তলায় গর্ত করে ১নং ছবির মত করে লাগাও। দেখবে যেন ব্যাটারী ক্ল্যাম্পের মাঝে ঠিক cellটার মাপমতো জায়গা থাকে।

এবার ট্রান্সফরমারটির দিকে তাকাও। দেখবে 230V লেখা দিকের দুটো পয়েন্ট ('প' ও 'ফ') ফাঁকা আছে। ঐ দুটো প্রান্তের একটা (ধর 'প') বাক্সের ঢাক্‌নার সাথে এবং

অপরটি (ফ) বাক্সের সাথে স্ক্রু কর বা সোল্ডার কর।

প্রয়োজনীয় একটা কথা বলি, সোল্ডারিং-এর সময় দেখবে যেন কোন তারের সাথে অন্য তার না ঠেকে যায়। এবার ব্যাটারীটা ঠিকমত ক্ল্যাম্প দুটোর ('চ' ও 'ছ') মাঝখানে বসাও। বাক্সর ঢাকনা দাও। মনে রেখো বাক্সর খেলা এবার শুরু।

এটা কিভাবে কাজ করছে দেখা যাক। যখন বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখা থাকবে তখন সুইচটা OFF অবস্থায় থাকবে। কাজেই বাক্সটাকে হাতে ছুলে কিছু হবে না— কিন্তু যেই বাক্সটাকে একটু তুলবে তখনই সুইচটা ON হবে ও বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ট্রানজিস্টরটি অসিলেটর (Oscillator) হিসাবে কাজ করবে। ফলে ট্রান্সফরমারের অন্যদিকে উচ্চ বিভব (High Voltage) উৎপন্ন হবে এবং শক্ খাবে।

তবে ভয় নেই, টিফিন চুরি খুব দোষের নয় কাজেই শক্‌টাও খুব ভয়াবহ হবে না।

অটো স্টার্ট রেডিও

রাতে খেতে বসে মেজদি-ই প্রথমে কথাটা তুলল ঃ এবার পুজোয় জামা-কাপড় চাই না, বরং সব্বাই মিলে বেড়াতে যাব।

হৈ হৈ করে সবাই মেজদির কথায় সায় দিই। বাবা, মা-ও রাজি। ব্যস, ঠিক হয়ে যায়—সার্কুলার ট্রেনের টিকিট কেটে সবাই যাব দক্ষিণে। বাড়িতে থাকবে ঠাক্‌মা আর মেজকা। পরমেশদা তো রান্নার জন্যে আছে-ই।

পাশের বাড়ির সমররা গেছে শুধু পুরী, চিল্কা ও কোনারক। আর আমি সেখানে ঘুরবো পুরো দক্ষিণ ভারত।

......কিরে সমর, খুব তো পুরী, চিল্কার কথা বলিস্—দেখেছিস কি মহীশুর প্যালেস, বৃন্দাবন গার্ডেনের ফোয়ারার সামনে ফিল্মি কায়দায় ছবি তুলেছিস ?

সমরের কালো মুখ দেখে হাসি পায়, হেসে উঠি হাঃ-হাঃ হাঃ......।

—কিরে পাগলের মত হাসছিস কেন ?

ঠাক্‌মার কথায় স্বপ্ন ভেঙে গেল। জড়িয়ে ধরলাম ঠাক্‌মাকে। ঠাক্‌মার মুখে কিন্তু হাসি নেই। মুখ যেন কেমন ভার ভার।

—ঠাম্মা, দুঃখ কিসের ? পুজোয় থাকছি না বলে মনখারাপ ?

সে তো হবেই বাবা। এই দেখ্ না তোরা তো চলে যাবি, আর দিনকয়েক পরেই তো মহালয়া—আমি তা শুনব কী করে ? তোর মেজকাকা যখন উঠবে তখন তো মহালয়া ছেড়ে পুজো শেষ। তার জুড়ে তুই তো দেখি কত কী করিস, দে না বাবা যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করে—যাতে কানের গোড়ায় আপনা থেকেই শুরু হয়ে যায় চণ্ডিপাঠ।

মাথা চুলকে ভাবলাম, ব্যাপারটা খুব 'প্যাঁদিচ্চোর'। কিন্তু বিপদটা যখন ঠাক্‌মার তখন মাথা তো দিতেই হবে।

মা যখন কিল চড় নানাবিধ মারাত্মক ধরনের বোমা নিয়ে এ্যাটাক করে তখন তো রাষ্ট্রসংঘ বলতে ওই 'ঠাম্মা'ই। তাই ঠিক করলাম আজকের রাতটা লাড়িয়ে দোব।

সারারাত কসরৎ করে, ঠাক্‌মার মহালয়া শোনার জন্যে যেটা খাড়া করলাম তা অনেকটা ওই ছবি নং—১ (ক) এর মত।
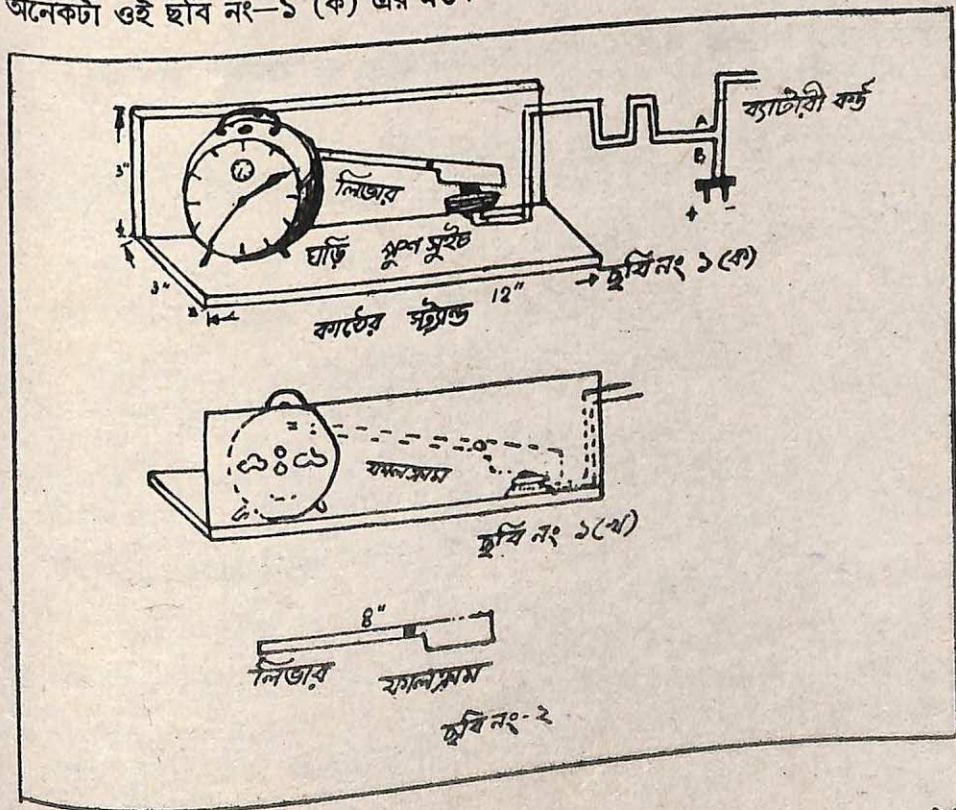
অ্যালার্ম-ক্লকটাকে বুক-শেল্ফের একদিকে বসালাম। নিজেই তৈরি করে নিই একটা লিভার (ছবি নং—২)। লিভারের বড় বাহুটি রয়েছে ঘড়ির অ্যালার্ম চাবির ওপর আর, অন্যদিকের ঠিক নিচে রাখি পুশ অন সুইচ [ছবি নং—১ (ক) ও (খ)]।

এবার আমাদের ট্র্যানজিস্টর রেডিওর ব্যাটারি কর্ডের দুটোর মধ্যে যেকোন একটি তারকে কেটে, পুশ অন সুইচের দু পোল থেকে আনা দুটো তারকে, কাটা তারের দুমুখে (A ও B) ব্ল্যাকটেপ দিয়ে জুড়ে দিই। বুক শেল্ফটা এবার দেখতে ঠিক ছবি নং—১ (ক)-এর মত হল।

অ্যালার্ম-ক্লকে দম দিয়ে, রেডিওটা অন্‌ করে, চুপিচুপি বুক-শেল্ফটা রেখে এলাম ঠাক্‌মার মাথার কাছে—।

'বন্দেমাতরম্‌' !—রেডিওর কণ্ঠস্বরে একসঙ্গেই ঘুম ভাঙে আমার ও ঠাক্‌মার।

ঘটনাটা ঘটল খাবার টেবিলে।

নটার ভোঁ বাজতেই বড়দা তড়িঘড়ি করে বসে পড়েছেন ভাত খেতে। গরম ভাত, ওদিকে আবার অফিসে যাওয়ার তাড়া। হাতের সঙ্গে মুখের কাজও চলছে দ্রুত তালে।

পাতের শেষ ভাত কটা যখন উঠু উঠু, ঠিক সেই মুহূর্তেই ম্যাজিসিয়ানের মত মুখের ভেতর থেকে বড়দা বার করলেন বি--রা—ট এক চুল!

ঠাক্‌মা বলেনঃ এ নিশ্চয়ই টিঙ্কুর কাজ। পই পই করে কতবার বলেছি আঁচড়ালে চুল যা ওঠে, তা থুথু দিয়ে বাইরে ফেলে দিবি। সে কথা কে আর শোনে।

টিঙ্কু ফোঁস করে উঠলঃ ওসব ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবে না। এই দুষ্কর্মটি যদি কেউ করে থাকে, সে হল ওই রিঙ্কু।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল, টিঙ্কু-রিঙ্কুর ফাইনাল খেলা। প্রথমে মুখোমুখি, তারপর চুলোচুলি। শেষটায় মায়ের হাত পড়তেই কান্না......।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।—বলতে বলতে বাজারের থলি হাতে রান্নাঘরে দাদুর প্রবেশ। এবার সরাসরি দাদুর আদালতে উঠল চুলোচুলির মামলা।

দাদু এক টিপ নস্যি নিলেন। মন দিয়ে শুনলেন পুরো ঘটনাটা।

—এ আর বেশি কথা কি! ইচ্ছে করলেই মানুষ এখন চাঁদে ব্রেকফাস্ট করে ফিরে আসছে। আর, এই চুলের মালিকের খোঁজ মিলবে না—এ কখনও হতে পারে।

দাদুর দু আঙুলে উঠে আসে আরেক টিপ নস্যিঃ এক কাজ কর, পাতের চুলটা নিয়ে আয়। আর, টিঙ্কু-রিঙ্কু তোদের মাথার চুল একটা করে ছিঁড়ে দে—এখুনি বলে দিচ্ছি পাতের চুলটা কার।......

ঘরটা অন্ধকার করে দাদু একটা যন্ত্রের মধ্যে চুলগুলো একের পর এক রেখে, কী সব খুটখাট করলেন।

তারপর টিঙ্কু-রিঙ্কুর দিকে মুখ ফেরালেনঃ এ চুল তোদের কারো নয়।

দু বোন খুশিতে মাতোয়ারা। আনন্দের চোটে একপাক নেচে নেয় দুজনে। রিঙ্কু অবাক চোখে তাকায়ঃ ওটা কী দাদু ?

—ওতো একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের স্কেল।

—আর, ওই সরু তারটা—যেটা টান টান লম্বা করে বাঁধা আছে—

—ও হল সেতারের চম্পকের তারের টুকরো। এখানে স্প্রিং-এর কাজ করছে।

সুযোগ পেয়ে টিঙ্কু এবার প্রশ্ন ছোঁড়েঃ ওটা কি নস্যির ডিবে ?

দাদু হাসেনঃ দূর পাগলী, নস্যির ডিবেতে কি আলো জ্বলে! ওটা একটা স্টার্টারের খোল। এর ভেতর একটা দেড় ভোল্টের বাল্ব জ্বালানো রয়েছে। বাল্বের আলো, চম্পকের তারের ওপর ঝালা আয়নায় পড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আর, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের স্কেলে ওই আলোটাকেই ত ধরেছি। আর ওই যে বাঁকানো তারের ক্লিপটা, যেটা পড়ে আছে সানমাইকাটার ওপর, ও'দুটোর মাঝেই তো রাখলাম তোদের চুল।

—কী করে হচ্ছে দেখ্।

—দেখছি তো—

—ছাই দেখছিস। শুধু চোখ থাকলেই দেখা যায় না, দেখার জন্য চোখ চাই। চুলটা লম্বা ক্লিপ আর সানমাইকার মধ্যিখানে ঢুকিয়ে দিলেই—ক্লিপটা চুলের ব্যাসের মাপে সরবে। এরফলে চম্পকের তারটা মোচড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটাও ঘুরবে। প্রথমে আলো আয়নায় পড়ে যে পথে যাচ্ছিল, আয়নাটা ঘোরার জন্য তা সামান্য ঘুরবে। সেটাই তো আমি মাপছি, দূরে রাখা ওই স্কেলে।

দুবোন এবার গলা জড়িয়ে ধরে দাদুর ঃ তা'লে ঠাক্‌মাকে বুঝিয়ে দাও না দাদু, ওই চুলটা আমাদের নয় !

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

চম্পকের তারটা টান করে দুটো ক্ল্যাম্পে লাগাবে। এই চম্পকের তারটার উপর একটা ছোট টিনের পাত আর বাঁকানো একটা তারের ক্লিপ [পেপার ক্লিপ খুলে লম্বা করে নিয়ে] রেখে একসাথে সোল্ডার করবে এমনভাবে যেন ক্লিপটা খুলে না যায়। টিনের পাতটার ওপর আয়নাটা [২ ক নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে] গালা দিয়ে লাগালে ভাল হয়। ২ খ নং ছবির মত কালো কাগজ দিয়ে আয়নাটা ঘিরে দিলে
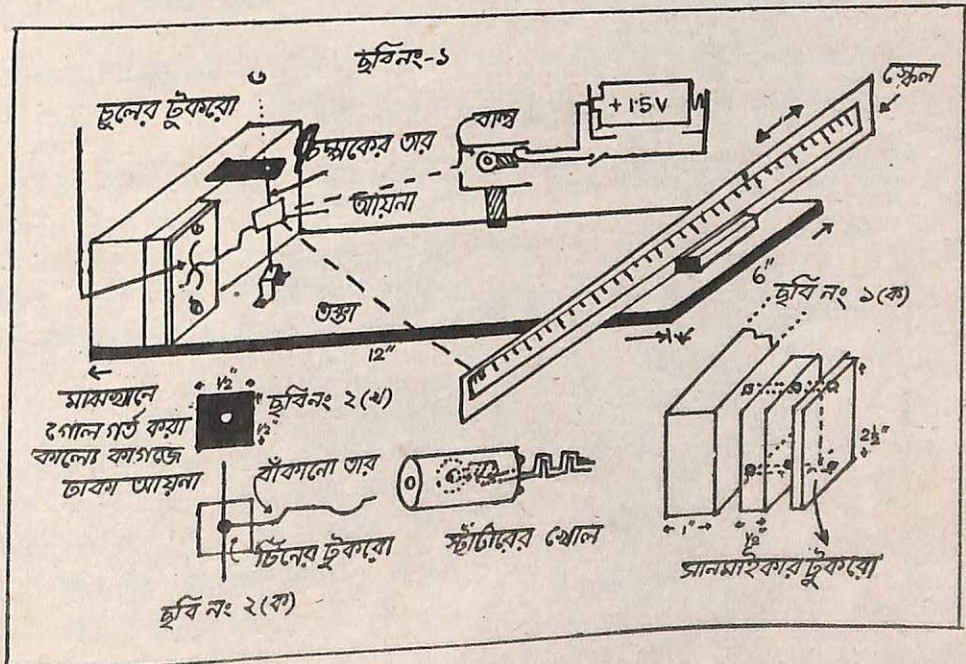
প্রতিফলিত আলো একটা একটা বিন্দুর মত স্কেলে পড়বে। এবার কিভাবে চুলের ব্যাস বা কাগজের বেধ মাপবে বলি।

ধর, চুলের ব্যাস X cm। এখন এই চুল সানমাইকা আর ক্লিপের মাঝে রাখলে, স্কেলে আলোকবিন্দু সরলো d cm।

যদি স্কেল থেকে আয়নাটার দূরত্ব হয় D cm, ও ক্লিপের লম্বা দূরত্ব হয় L cm, তবে

$X = \frac{L.\ d}{2D}$ cm; এখানে L, D-এর মান যন্ত্রের জন্য ধ্রুবক।

শুধু d-এর মান পরিবর্তিত হবে।

$$x = \frac{L.}{2D} \times d\ \text{cm} = K.\ d.\ \text{cm}$$

যেখানে $K = \frac{L}{2D}$

যদি পার, বুদ্ধি করে যন্ত্রের জন্য নিজস্ব মান তৈরি করে নিও।

সামনে পাঁচ-ছজন বিচারক। ভাবলেশহীন মুখে তাঁরা তাকিয়ে আছেন খুকুর-মডেলটার দিকে। বীরবিক্রমে খুকু বলতে শুরু করল তার মডেল 'লেটার বক্স'। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে, ফার্স্ট প্রাইজ তার চাই-ই চাই।

আর পাঁচটা লেটার বক্স থেকে এই লেটার বক্সটা আলাদা। এর নাম দিয়েছি অটো লক লেটার বক্স।

সাধারণ লেটার বক্স-এ যদি পিওন চিঠি ফেলে যায়, আপনি জানতেও পারবেন না। রুটিন মাফিক আপনাকে প্রতিদিন দেখে যেতে হবে, চিঠি এল কি এল না। তাছাড়া চুরির ভয়ও আছে।

কিন্তু আমার এই ছোট্ট লেটার বক্স,—নতুন উদ্যমে শুরু করল খুকু: এতে এই দুটো প্রবলেমই চমৎকারভাবে সল্‌ভ করা হয়েছে।

ধরুন পিওন এসে টুক্‌ করে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেল।—খুকু নিজেই দেখায়: অমনি, ঐ দেখুন কলিং বেলটা বেজে উঠল। সাথে সাথে জ্বলে উঠল আলোটাও। অবশ্য ইচ্ছে করলে এই ব্যবস্থাটা আপনি নাও রাখতে পারেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল চিঠি ফেলার এই গর্তটা।—খুকুর মুখে মুচকি হাসি: চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, লক হয়ে গেল গর্তটা। চিঠি চুরির কোন ভয়ই নেই। এবার আপনার সময়মত আপনি চিঠিটা বার করে নিতে পারেন। নিশ্চিন্তে,
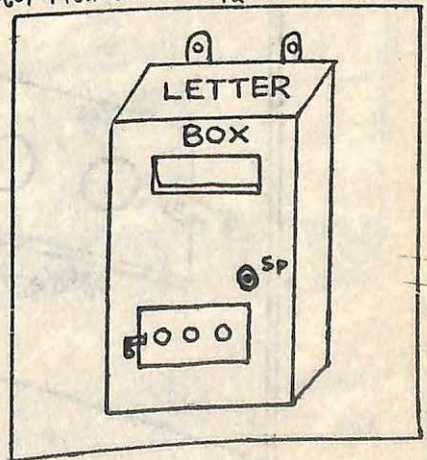
লেটার বক্সের সামনের অংশ
ইলেকট্রোম্যাগনেট
বোল্ট
ঢাকনা
রিলে বক্স
Sp
চিঠি বার করার দরজা
সামনের দেওয়ালের পিছনের পিঠ

নির্ভাবনায়।

আপনারা হাত দিয়ে দেখুনই না, কেমন লক্‌ হয়ে গেছে।—খুকু নিজেই ঠেলে ঢাকনাটা।

এখানে কোনরকম ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করি নি। তাই দামেও বেশ সস্তা।—দম নেয় খুকুঃ মাত্র একটা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটকে কাজে লাগিয়েই এই পুরো সিস্টেমটাকে খাড়া করেছি।

এবার বলি, কিভাবে তৈরি হল এই লেটার বক্স। একটা ১২ ভোল্টের ইলেকট্রোম্যাগনেটকে লেটারবক্সের 'ঢাকনার' ভেতরদিকে আড়াআড়িভাবে বসিয়েছি। এবার তিনটে ক্ল্যাম্প, ম্যাগনেটের ঠিক সামনের ঢাকনার ওপর একটা, আর বাকী দুটো বাক্সের গায়ে বসিয়েছি একই সরল-রেখায়।

পাশাপাশি দুটো ক্ল্যাম্পের মধ্যে একটা লোহার বল্টুকে (B) স্প্রিং (S) দিয়ে এমনভাবে বসিয়েছি, যাতে ম্যাগনেটটা টানলে বল্টুটা ঢাকনার ক্ল্যাম্পের মধ্যে ঢুকে সিস্টেমটা লক করে দেয়।

তালা খুলে যেই আপনি চিঠি বার করবেন, অমনি ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেট বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, হারিয়ে ফেলছে আকর্ষণ বল। ফলেস্প্রিং-এর টানে বল্টুটা ফিরে আসছে তার নিজের জায়গায়। লক্‌টা খুলে যাচ্ছে।

এবার পুরো সার্কিটটা দেখুন।—স্টিক হাতে খুকু ছবির বোর্ডের দিকে এগোয়ঃ ঢাকনার ঠিক পেছন দিকে আমি একটা (N.C.P.O.) "নরম্যালি কন্‌টাক্‌ট পুশ অফ্‌
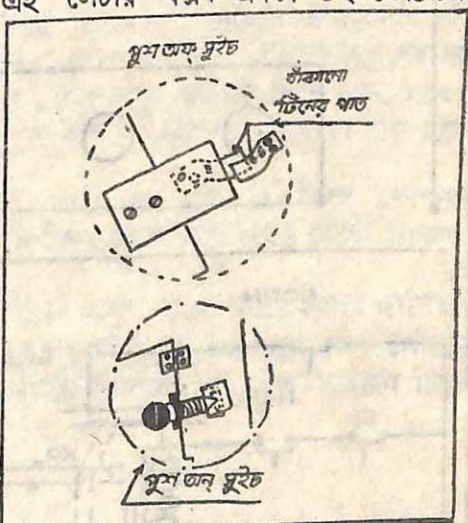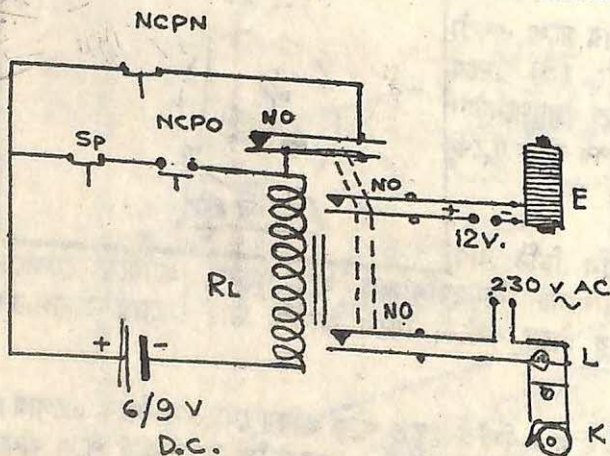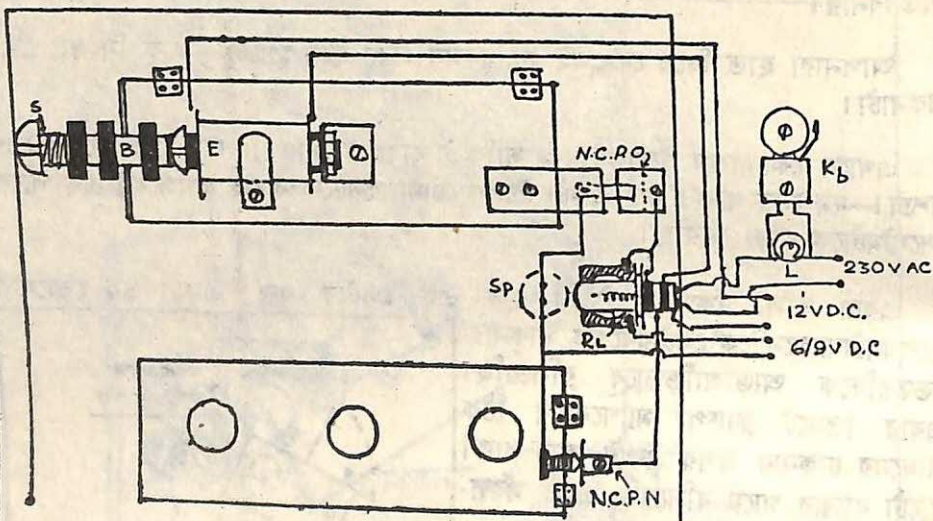
সুইচ” (Normally contact push-off switch) রেখেছি। লেটার বক্সের নিচে লেটার ওপ্‌নার [দরজা]-এর পেছনে ঠিক কব্জার কাছে আমার তৈরি ”নরম্যালি ওপ্‌ন্‌ পুশ অন্‌ সুইচ” (N.C.P.N.) রাখা।

দরজাটা খুলে চিঠিটা বার করলেই পুশ অন (N.C.P.N.) সুইচটা অফ্‌ হয়ে সার্কিট ছিন্ন করবে। ফলে ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটটা বিদ্যুৎ-ছিন্ন হয়ে স্প্রিং-এর টানে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে।

পোস্টম্যান চিঠি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাটা উঠে গিয়ে পুশ অফ্‌ সুইচটাকে (N.C.P.N.) অন করে সার্কিটটা চালু করবে। সার্কিটের ঐ রিলেটা (RL) ওর কন্‌ট্যাক্ট পয়েন্টগুলোকে চালু করবে। পুশ অফ (N.C.P.O.) সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে রিলেটা (RL) এবার নতুন সার্কিট দিয়ে চালু হবে। কারণ পোস্টম্যানের চিঠি ফেলার পরেই পুশ অফ (N.C.P.O.) সুইচটা অফ হয়ে যাচ্ছে।

বিচারক মাথা দোলাতে থাকেন,—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু পোস্টম্যান যদি পরপর দশটা চিঠি ফেলতে চায়, তখন কি তোমায় কড়া নেড়ে ডেকে আনবে?

তার জন্যও আমি ব্যবস্থা রেখেছি।—খুকুর মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসিঃ সার্কিটে ঐ যে দেখছেন একটা পুশ অফ * সুইচ রাখা আছে ওটা পুশ্‌ করে পোস্টম্যান যত খুশি চিঠি ফেলতে পারে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পর পুশ্‌ সুইচটা টিপেও আর লক্‌ খোলা যাবে না।......

বিরাট হাততালির মধ্যে রাজ্যপালের হাত থেকে প্রথম পুরস্কারটা সগর্বে নিল খুকু। অজস্র ফটোগ্রাফারের ক্লিক্‌-ক্লিক্‌, টেপ কাঁধে রিপোর্টারদের একরাশ প্রশ্ন,—বল, তুমি কিছু বল!

---

* পুশ অফ সুইচ—*Sp*

খুকু শুধু বলে,—মডেল তৈরির কৃতিত্ব আমার নয়। আমার দাদাদের। বিশ্বাস করতে চায় না কেউই।......

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-অভিনন্দনের ভারে ক্লান্ত খুকু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। ধড়মড়িয়ে মা উঠে জল দেয় খুকুকে। খুকু আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

পিওনকে আগে থেকে জানিয়ে রাখবে ব্যাপারটা। এতে ভুল কোরো না। নইলে কড়া নেড়েই ঘুম ভাঙাবে তোমাদের। অথবা লেটার বক্সেও লিখে রাখতে পার।

তোমরাই বল, শুধু টিফিনের পয়সায় কি গরমের মূল্যবান বিকেলগুলো চলে? কত কী কেনার আছে? অবশ্যি খাবারও আবার রকম ভেদে অনেক। যেমন ধর, এই আইসক্রীম, ফুচকা আরও কত কি!

আবার শ্যাম থাপার ব্যাক-ভলি দেখতে গেলে কি শুধু ষাটটা পয়সায় লাইন দেওয়া যায়! বাস ভাড়াটা না হয় হেঁটেই ম্যানেজ হল। কিন্তু স্যাকারিন দেওয়া ঠান্ডা জল না খেলে, এক নাগাড়ে দু-তিন ঘন্টা ঘোড়ার ক্ষুরের ওপর নজর রাখব কি করে?

তাই জমা-খরচের পাল্লা সমান করতে, বলতে লজ্জা নেই, শেষ পর্যন্ত চোখ পড়ল বোনের টিফিনের পয়সায়।

কিন্তু সহজে কি আর ওর টিফিনের পয়সা পকেটস্থ করা যায়। যতই হোক্ আমারই বোন তো! তার ওপর ওর সঙ্গে আবার আমার সমমেরুর সম্পর্ক। ও যদি বলে জল উঁচু, তবে পৃথিবীর নিয়মে আমি জল নিচু দেখবই।

তবু শেষ রাউন্ডের বুদ্ধির প্যাঁচে জয়ের মালা দুললো আমারই গলায়।

এ ব্যাপারে পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন অবশ্য বিজ্ঞানী নিউটন। আর প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেনঃ

সুহাসের বোন—খেলার গামলা দিয়ে;

গুল কয়লার পেটি—ভাঙা অংশ দিয়ে;

বুটপালিশওলা—গোটা চারেক পেরেক দিয়ে;

এবং

বোন—টিফিনের পয়সা দিয়ে।

পেটি-ভাঙা তক্তাটুকুর ওপর পেরেক ঠুকে ছ ইঞ্চি আন্দাজ বাটাম খাড়া করলাম। তার ওপর গামলাটা বসিয়ে দিই পেরেক দিয়ে। এবার ইঞ্চি চারেক দূরে দু'টো পেরেক দিয়ে (ছবির মত) দশ ইঞ্চি লম্বা লোহার পাত (পেটি থেকে ছাড়ানো) তক্তার ওপর লাগিয়ে দিলাম। মাসির দেওয়া 'গ্রিটিংস্ কার্ড'টা রাখি গামলার ওপর।

বোনের সঙ্গে বাজি রইল, ও কার্ডের ওপর পয়সা রাখবে আর আমি টিনের পাত (যেটা এখানে স্প্রিং হিসেবে কাজ করছে) দিয়ে ধাক্কা দেবো। যদি পয়সা গামলার বাইরে পড়ে, তবে আমার টিফিনের পয়সা সেদিন ও খরচ করবে। আর পয়সাটা যদি গামলার ভেতরে পড়ে, তবে ওর টিফিনের পয়সা আমার হাতে আসবে।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন থেকে বোনের টিফিনের পয়সা, মায়ের হাত থেকে আমার হাতেই আসে—বোনের হাত ঘুরে।

তোমাদের কাছে বলেই ফেলি এর কারণটা। নিউটনের কথায়ঃ স্থির বস্তু সব সময় চেষ্টা করে তার স্থির অবস্থা বজায় রাখার।

তাই পয়সা আমার মুখ চেয়ে গামলায় পড়েছে, পড়ছে ও পড়বে......।
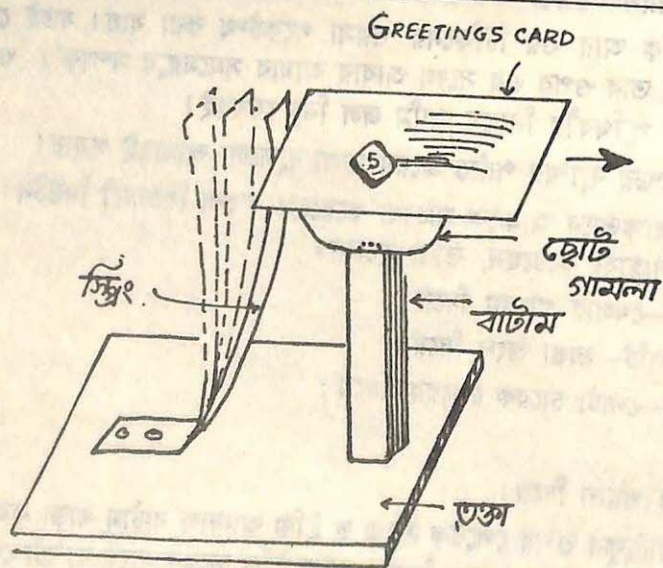
ছবি নং-১

মিনি ক্যালকুলেটর

ভিজে চুপচুপে হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেল্টুদা সিধে আমাদের ঘরে এসে হাজির।

আরে, তুমি!—কেল্টুদার ঝোড়ো কাকের মত চেহারা দেখে চমকে উঠলামঃ কি ব্যাপার। আগে মাথা-টাথা মোছো......

—দাঁড়া, দাঁড়া মানিকজোড়! চটপট বল্‌তো, ৩৭৫ কে ৩৩ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?

এ কি মুখে মুখে করা যায় নাকি?—কেল্টুদার ব্যাপার স্যাপার দেখে ফন্টে থঃ আমি তো আর শকুন্তলা দেবী না।

আমি বলছি!—কেল্টো সগর্বে বুক ফোলায়ঃ ১২,৩৭৫। গুণ করে মিলিয়ে নে।

আর ক্যারামতি দেখিও না।—আমি খেঁকিয়ে উঠিঃ আগেভাগে নামতা মুখস্থ করে......করতো ৭৫ কে ২৩ দিয়ে গুণ?

হাতের তালুতে কি একটার উপর হাত চালায় কেল্টুদা। তারপর মুখ তুলে হাসেঃ ১৭২৫। কি র‍্যা, ঠিক তো?

এ্যাঁ!!!—এবার সত্যিই আমরা আঁতকে উঠি।

ফন্টে বিড়বিড় করে,—নন্টে এত জলদি করল কি করে রে বাবা, অঙ্কের নামে তো কেল্টোর ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরে। তবে কি ওকে আর্যভট্ট ভর করল নাকি?

হুঁ—হুঁ বাব্বা! এ বড় মজার জিনিস!—থার্টি টু অল আউট করে কেল্টুদা মাথা দোলাতে থাকে।

আর সইতে পারি না,—দেখি, হাতের ও জিনিসটা কি?

ও তোরা বুঝবি না, গবেট হাঁদারাম!—সটান বেরিয়ে গেলো কেল্টুদা।

দাঁত কিড়মিড় করে ফন্টে,—ঠিক আছে, এর জবাব ওকে দোবো।

3×1.5V
SWITCH
10Ω
SK 100
BC 107
220K
4.7 kpf
1k
100Ω
10K
1K
HEAD PHONE
R1
R3
R2
CALCULATOR
প্যানেল বোর্ড
X1/10
X1
X10
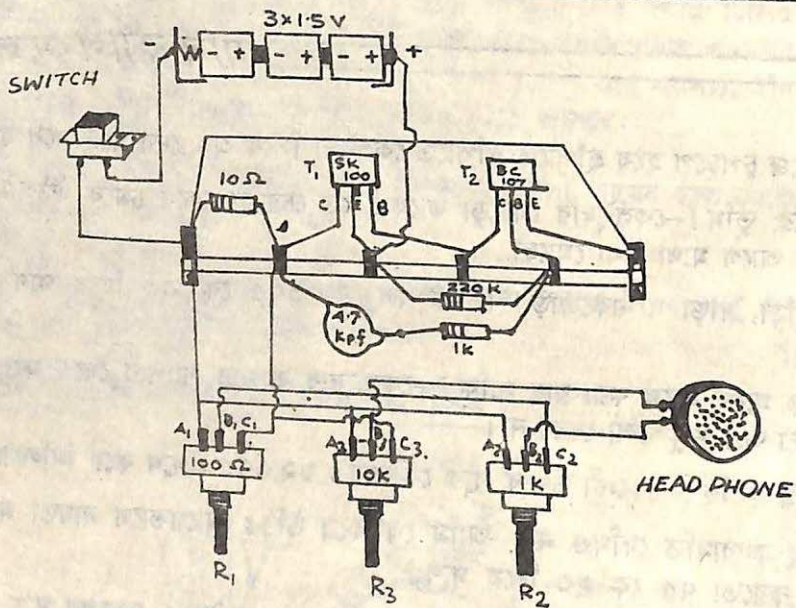
ছবি নং-১
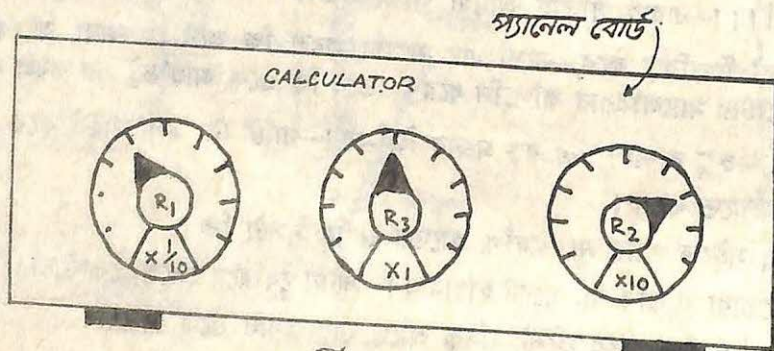
ছবি নং-২

—ঠিক বলেছিস্।

পরদিন সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই ছুটলাম আদি অকৃত্রিম আমাদের বাণী মৌলিকের কাছে।

—কি ব্যাপার বলুন তো! 'কেল্টু দি গ্রেট' গতকাল মুখে মুখে গুণ করে দিল!

বাণী মৌলিক হাসেন: ওমা, ওটা তো তোমরাও করতে পার। বিজ্ঞান আজ কোথায় গিয়ে পোঁছেছে, কিছুই তো জান না বাছারা! কেল্টু আর অঙ্ক শিখল কোথায়? কাল ও তো আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেল 'ক্যালকুলেটর', তোমাদের ভেল্কি দেখাবে বলে।

তবে দিন না, একটা তৈরি করে।—ফন্টেটা ছেলেমানুষের মত আব্দার ধরে: আমরাও ওকে মজা দেখাবো।

তোমরা পারবে না!—করুণার হাসি হাসেন বাণী মৌলিক: এ জাতীয় ক্যালকুলেটর বাজারে মেলে। ওতে অনেকরকম দামী দামী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র থাকে, যেমন ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ইউনিট, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট...এইরকম কত কি। তবে সহজে তোমাদের বাতলে দিতে পারি একটা যন্ত্র, যাকে 'মিনি ক্যালকুলেটর' বলা যায়। এতে শুধু গুণভাগ চলতে পারে। হবে তো?

হ্যাঁ—হ্যাঁ ওতেই হবে!—তড়াং করে লাফিয়ে উঠি: কেল্টোর বিদ্যের দৌড় জানা আছে। তড়িঘড়ি বলুন তো, কি কি জোগাড় করতে হবে?

ফন্টে বসে পড়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে।

বাণী মৌলিক ঢাউস পেটমোটা এক ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করলেন। কিসব আঁকা আছে তাতে।

কি কি লাগবে লিখে নাও তোমরা।—বাণী মৌলিক শুরু করেন:

১. ট্রানজিস্টর—SK 100 (T_1) ও BC 107 (T_2)

২. রেজিস্ট্যান্স—10 Ω (ওহ্ম্স্), 1K Ω ও 220 K Ω.

৩. ক্যাপাসিটা—4.7 Kpf.

৪. লিনিয়ার পোটেন্‌সিয়োমিটার—100 Ω, 10K Ω, 1K Ω

৫. হেড্‌ফোন, ব্যাটারী, পয়েন্টার নব (তিনটে), সুইচ ইত্যাদি।

এই ক্যালকুলেটরের দুটো ভাগ—অসিলেটর ও পোটেনসিয়োমিটার। অসিলেটরের কাজ হলো একটা উচ্চ কম্পাংকের সিগন্যাল তৈরি করা, যা পাঠানো হবে পোটেনসিয়োমিটার। এই পোটেনসিয়োমিটারে আবার তিনটে পোটেনসিয়োমিটার আছে (R_1, R_2 ও R_3)। প্রথম পোটেনসিয়োমিটার বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক যন্ত্রকে, যা দিয়ে আমরা Potential বা বিভব তুলনামূলকভাবে মাপতে পারি।

ঠিকমত গুণভাগ করতে হলে দরকার, সঠিক ক্যালিব্রেশন (Calibration)-এর। তারজন্য প্রতিটি পোটেনসিয়োমটারের রোটেশনাল রেঞ্জ বার করে তাকে ১০০ ভাগে ভাগ করবে।

রোটেশনাল রেঞ্জ বার করবার জন্যে পোটেসিয়োমিটারগুলোকে নব সমেত একটা কাগজের উপর রাখবে। এবার রড্‌টা বাঁদিকে যতদূর ঘোরানো যায়, ততদূর নিয়ে গিয়ে কাগজের ওপর সেখানে একটা বিন্দু দেবে।

এবার উল্টোদিকে যতদূর যায়, নিয়ে গিয়ে আর একটা বিন্দু একইভাবে দেবে। এবার পোটেন্‌সিয়োমিটার রডের অবস্থানের কেন্দ্রস্থলে একটা বিন্দু ধরে আগের দেওয়া বিন্দুদুটোর সঙ্গে যোগ করো।

এইভাবে যে প্রবৃত্ত কোণ উৎপন্ন হলো, তা চাঁদা দিয়ে মেপে নেবে। পোটেন-সিয়োমিটারের এটাই হচ্ছে রোটেশনাল রেঞ্জ। সাধারণতঃ এর মান হবে ৩০০°। কাজেই ওই ১০০ ভাগের ১ ভাগের মান হয় ৩°।

একটা পরিষ্কার পিচ্‌বোর্ডে কাগজ সেঁটে ডায়ালগুলো এঁকে নাও। ব্যাস ৩″ ইঞ্চি করবে। নইলে ক্যালিব্রেশনে অসুবিধে হতে পারে।

বাব্বা!—ফন্টে গোঁজিয়ে ওঠেঃ আর কতদূরে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! শেষ হয়ে গেল তো?

আরে, না—না! বাণী মৌলিক আমাদের আশায় ছাই ঢেলে দেন: এ তো গেলো পোটেনসিয়োমিটারের কথা। এবার অসিলেটরের কথা শোন!

T_1, T_2 ট্রানজিস্টরদুটোকে একটা ট্যাগবোর্ডের উপর এমনভাবে বসাবে, যাতে T_1-এর বেস ও T_2-এর কালেকটর একপয়েন্টে থাকে। [ছবি নং ১] T_1-এর কালেকটর 10 Ω ও 4.7 Kpf-এর সংযোগ পয়েন্টে ঝেলে দেবে। 4.7 Kpf-এর অন্য পোলটা 1K Ω -এর সংগে সিরিজে জুড়ে T_2-র বেস-এ লাগাবে। T_1-এর এমিটার 220 K Ω হয়ে T_2-র বেস-এ আসবে। ব্যাটারী ক্ল্যাম্পের পজিটিভ (+) দিকটা T_1-এর এমিটারে দেবে। 10 Ω -এর খোলা মাথাটা যাবে T_2-র এমিটারে। এই পয়েন্ট থেকেই একটা তার বেরিয়ে সুইচ হয়ে ব্যাটারী ক্ল্যাম্পে যাবে। T_2-র এমিটার 10 Ω -এর সুইচের দিকের সংগে তার দিয়ে জুড়ে দেবে।

ব্যস, অসিলেটার-এর সার্কিটের দিকটা শেষ।

যাক্।—হাঁফ ছাড়ি আমরা।

দাঁড়াও—দাঁড়াও।—বাণী মৌলিক পুর্ণোদ্যমে শুরু করেন:

এবার প্যানেল বোর্ডে (ছবি নং ২) R_1, R_2 ও R_3 ডায়াল সমেত লাগবে। তোমাদের সুবিধের জন্যে A_1 B_2 C_3......করে পোটেনসিয়োমিটারের ট্যাগগুলোকে নাম্বার করে দাও।

কি করবে শোন:

১) A_1, A_2 ও A_3 সর্ট করে T_2-র এমিটার ও 10 Ω -এর সংযোগে নিয়ে যাবে।

২) B_1 ও C_3 সর্ট করবে। B_2 ও B_3কে হেডফোনে দেবে।

৩) C_1 ও C_3 সর্ট করে T_1-এর কালেকটরের পয়েন্টে পাঠাবে।

যন্ত্রটি তৈরি হলে এটাতে কিভাবে গুণ বা ভাগ করবে বলি। এই পর্যন্ত বলেই বাণী মৌলিক কাগজ পেন্সিল ধরলেন:

নিজে করো

যেহেতু, $R_1 : R_2 : R_3$=১ : ১০ : ১০০=$\frac{১}{১০}$: ১ : ১০

সেহেতু, R_1 যা দেখাবে তাকে ১০ দিয়ে ভাগ করতে হবে আর R_3 যা দেখাবে তাকে ১০ দিয়ে গুণ করতে হবে।

ধর, ৫০ কে ৬ দিয়ে তোমরা গুণ করতে চাও। R_1-কে ঘুরিয়ে ৬০-এ নিয়ে যাবে, অর্থাৎ ৬-এ (৬০× $\frac{১}{১০}$) R_3-কে রাখবে ৫০-এ আর R_2-কে সরিয়ে এমন জায়গায় আনবে যেখানে হেডফোনের আওয়াজ ঠিক বন্ধ হয়ে যায়। দেখবে R_2-এর ডায়াল দেখাবে ৩০। অর্থাৎ, ৩০×১০=৩০০। কেমন?

ধর, ৫৬০-কে ৭ দিয়ে ভাগ করতে চাও। তখন, R_2-কে রাখবে ৫৬-তে (৫৬×১০=৫৬০)। R_1 কে রাখবে ৭০ এ, আর R_2 ঘোরাতে থাকবে যতক্ষণ না হেডফোনের আওয়াজ বন্ধ হয়। এখন R_3-র কাঁটা দেখাবে ৮০ (৫৬০÷৭=৮০)।

কি, জিনিসটা বোধগম্য হলো?

জবাব নেই। থ্রীচিয়ার্স ফর—সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলাম।

বাণী মৌলিক। হিপ্ হিপ্ হুররে!—ফন্টে যোগ করে।

পরের দিন সকালে দুজনে সোজা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে। প্রসঙ্গতঃ বলি, সকালে স্যার যখন প্রাতঃকৃত্যে যান, সেসময় কেল্টো স্যারের ঘরে অধিষ্ঠান করে। দেখি, ব্যাটা লাটসাহেবের মত 'স্যারে'র চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মৌজসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সারা পৃথিবীটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের দেখে প্রশ্ন করে,—কি ব্যাপার, সাতসকালে মানিক জোড়?

তর সয় না ফন্টের। হুট করে প্রশ্ন ছোঁড়ে,—বল-না, কাকে দিয়ে কতকে গুণ করতে হবে?

তা তোরাও একটা কু-ক্যালকুলেটার কিনলি নাকি?—তোতলাতে শুরু করে কেল্টুরাম।

—না দাদা—না, আমাদের ট্যাঁকের ওজন তোমার মত নয়। তাই বাণী মৌলিকের পরামর্শে নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছি।

অফিস থেকে ফিরছি বাদুড়ঝোলা হয়ে। যেকোন মুহূর্তে মারাত্মক কান্ড ঘটে যেতে পারে। সবারই অসম্ভব তাড়া, একমুহূর্ত দেরি হলে মহাভারত বুঝি অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এরমধ্যেই আরো জ্বালা—অফিস ফেরতা বাবুদের আধুনিক অ্যাটাচি-কেসগুলো। ট্রেন মাঝেমধ্যে দুলুনি দিতেই যখন তখন কৈলে বাছুরের মত 'ঠ্-না-ৎ' করে গোত্তা মারছে, পায়ে, পিঠে ঘাড়ে সর্বত্র। সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে তাকাচ্ছে চারদিকে—ভাববেশহীন মুখ এক একটা, ভাজা মাছ যেন উল্টে খেতে জানেন না।

এই নিদারুণ পরিস্থিতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম ঃ

ইঁদুর কতরকমের হয় জানেন ?

ঘাড় অতিকষ্টে ঘুরিয়ে দেখি, এক ভদ্রলোক। মুচকি হেসে উনি শুরু করলেন ঃ

জানেন না. তাই তো! এই ধরুন নেংটি, ধেড়ে বুনো, গেছো, ছুঁচো মার্কা...... তবে হ্যাঁ, ভয় আমাদের নেংটি নিয়ে। সাইজে মিনি হলে কি হবে, কাজে কম্মায় এক একটা নিউট্রন বোম। বোঝবার আগেই চার্জ হয়ে বসে থাকবে। এদের কাছে বড় নেই, ছোট নেই, ভাল নেই, মন্দ নেই, সর্বধ্বংসী কলিযুগের শয়তান। এরা কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না, আপনি আমি তো কোন্ ছার, এমনকি প্রেসিডেন্টকেও না ! তাই বলি, না—না আর বাড়তে দেবেন না। ভাবছেন বুঝি 'র‍্যাটকিল'-এর কথা বলছি। উঁ-হুঁ, ওতে আর কিস্যু হয় না। ওসব বেমালুম হজম করে ওরা নীলকণ্ঠ।

এ অধম এক সমাজসেবী। আপনাদের সেবায় আমার জীবনধারণ। স্যার একমিনিট এট্টু কষ্ট করে, ঘাড় চাগিয়ে আমার এই যন্ত্রটা দেখুন। এটা বাজারের সস্তাদরের ইঁদুরকল নয়, যা দিয়ে শুধু ইঁদুরকে ভয় দেখান চলতে পারে, পাকড়ান যায় না।

হ্যাঁ স্যার, ব্যাটারীচালিত এ এক অভিনব ইঁদুর ধরার কল! দাম মাত্র ১৫ টাকা—১৫ টাকা—১৫ টাকা।

কিন্তু কোম্পানীর প্রচারের খাতিরে এখন দেওয়া হচ্ছে বিরাট ছাড়, দাম হচ্ছে ১২ টাকা—১২ টাকা—১২ টাকা।

একবার ইঁদুর এই কলে পড়েছে কি, গিলোটিনের থেকেও সাংঘাতিক প্রাণদন্ড। তা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরও নেই।

বলুন দাদা, বলবেন, বলবেন—ভদ্রলোক এবার থেমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন কলটাকে।

—প্রয়োজন হলে ডাক দিয়ে চেয়ে নেবেন। এদিকে, এদিকে কেউ নেবেন ? অতি সস্তা, বলবেন, বলবেন......

নতুন জিনিস! ব্যাটারী চালিত, বেশ মজাদার তো! কারিকুরিটা কি, জানতে হচ্ছে।

একটা সংগ্রহ করলাম একডজন টাকা দিয়ে।

বাড়ি পৌঁছে তর সয় না। চটপট বসে গেলাম কেরামতিটা দেখতে।

আরে, এ কি! এতো নিজেই বানিয়ে নেওয়া যেত। আছে তো খালি একটা তারের জাল, দুটো অ্যালুমিনিয়ামের U আকৃতির স্লাইডার, কাঠের তক্তা আর বাটাম। আর এখানে দেখছি, আছে একটা হাতে জড়ানো ইলেকট্রোম্যাগনেট। সামনে বসানো ক্ল্যাম্পে বোল্টটা ঢোকানো আছে। বুঝলাম, যখন ঐ বোল্টটা চুম্বকটা টানবে, সামনের ঢাকনাটা স্লাইড দুটোতে গাইড হয়ে পড়ে যাবে 'সড়াৎ' করে।

কিন্তু গেল কোথায় সুইচটা ? যেটা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটকে অন্‌ করবে ?

হুম্‌, ঠিক ধরেছি। সুইচ যেটাকে জালের খাঁচার ঢোকার ঠিক আগে ইঁদুর চাপ দিয়ে অন্‌ করবে, সেটা রাখা আছে, বেশ বুদ্ধি করেই, একটা পিচ্‌বোর্ডের নিচে টিনের পাত দিয়ে তৈরি করে।

বোল্ট
ঢোকার গর্ত
তারের জাল
ক্ল্যাম্প
ইলেকট্রোম্যাগনেট
কাঠের
বাটাম
কাঠের
ঢাকনা
স্লাইড
স্লাইড
টিনের পাতটি
পিচবোর্ড
6V
DC
+
বোল্ট
ইলেকট্রোম্যাগনেট
ইলেকট্রোম্যাগনেট
6V D.C
+
টিনের পাতের
সুইচ
পিচবোর্ড
– 6V.
+
টিনের পাতের সুইচ

নিজে করো
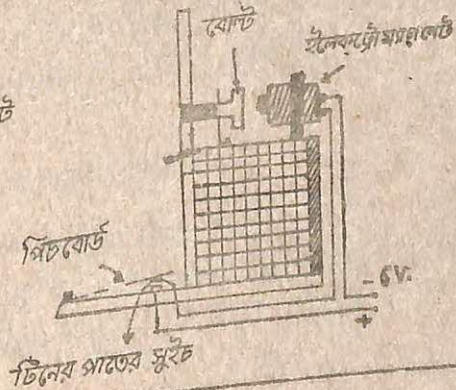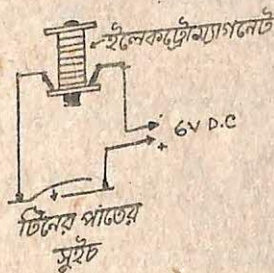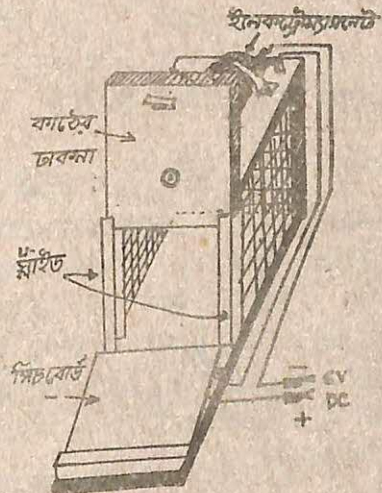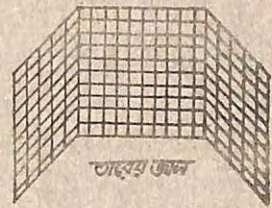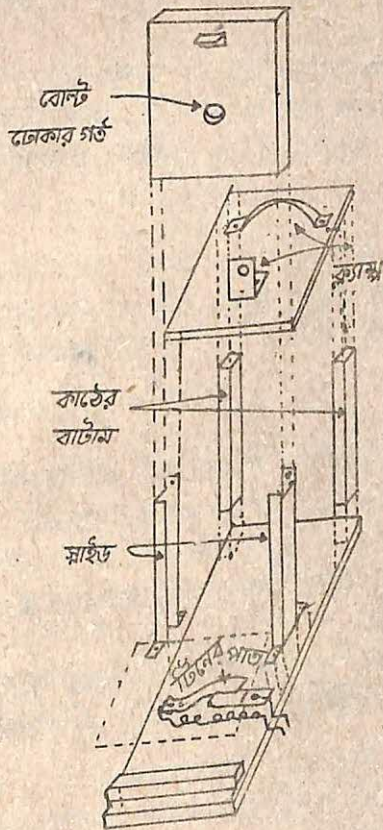
যাই হোক্, জিনিসটা দারুণ মজার। অত্যন্ত অল্প ঝঞ্ঝাটে বেশ কাজের জিনিস।

দেরি নয়। তাড়াতাড়ি ছবিটা এঁকে রাখি। একবার মায়ের চোখে পড়লেই তো চিত্তির! মুহূর্তে এটা এখান থেকে উধাও হয়ে আশ্রয় নেবে, আনাচে-কানাচে, নেংটি নিধনের মহাযজ্ঞে। কিশোর ভারতীর জন্যে এটাকে পাঠাবার প্ল্যানটা মাঠেই মারা যাবে তাহলে।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

মনে রাখবে, ইলেকট্রোম্যাগনেট ও বোল্টের মাথাটা যেন এক সরলরেখায় থাকে। ইলেকট্রোম্যাগনেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, দামেও বেশি নয়। তবে আরো সস্তায় বাড়িতেও বানিয়ে নিতে পার, স্বচ্ছন্দে। সরু এনামেলের তার (২০-২২ গেজের) একটা ½" ফরমারে ভাল করে জড়িয়ে নেবে ১০০ থেকে ২০০ পাক। এর ভেতরে ভরে দেবে একটা বোল্ট। সুইচের টিনের পাতদুটো খুব পাতলা টিনের পাত দিয়ে বানাবে, যাতে ইঁদুরের মত স্বল্প ওজন পড়লেই পাতদুটো গায়ে গায়ে ঠেকে সুইচ অন্ হয়ে সার্কিট চালু হতে পারে। ব্যাটারী বাক্সটা তোমাদের সুবিধামত যেখানে খুশি রেখ।

নিঃসঙ্গতা যখন আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে ধরে, মন তখন স্মৃতির পাখায় ভর করে উড়ে যেতে চায় দূরে আরও দূরে।......

বসে আছি শান্ত, সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে, সোনা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। ধুলো উড়িয়ে চলেছে ধানে বোঝাই গরুর গাড়ী—হেট্ হেট্। শান্ত নদীর বুকে পাল তুলে চলেছে নৌকো, ভেসে আসে আকাশবাতাস জুড়ে অপরূপ ভাটিয়ালী গান।

এ্যালবামের পাতা ওল্টাই।

মনে পড়ে যায়, দিগন্তবিসারী চিল্কার বুকে একচিলতে ওই পাথরটাকে। যেদিকে তাকাই— শুধু জল আর জল। শহরের কোলাহল নেই। নেই আকাশ-চুম্বী অট্টালিকার সারি। উন্মুক্ত আকাশ, নিস্তব্ধ চরাচর। শরীরটা এলিয়ে দিই নীল জল আর আকাশী ঐ আকাশের মাঝে।

পাশে আধশোয়া বন্ধুকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই—আচ্ছন্নতা ভাঙে। সম্বিত ফিরে পাই নিমেষে। মনে হয়, এ তো শুধুই ছবি, বইয়ে গাঁথা।

ছুটে যেতে চায় মন। ফিরে পেতে চাই ফেলে আসা সেই মুহূর্তগুলো। কিন্তু হায়, জীবনের ছবিতো আঁকা হয়ে গেছে অনেক দিন। দিবা রাত্রি তুলি বোলানোই ত বাকি জীবনের কাজ। সব জেনেও মন মানে না—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় ঐ ছবির মাঝে।

মনের টানে তৈরি করতে বসি এক ঘরোয়া প্রজেকটর।

যোগাড় করি তিনটে লেন্স (৪" ফোকাল লেন্সের ২" ব্যাসের)। আর ৩" সাইজের দুটো জর্দার কৌটো (ব্যাস ২½")। এদের একটার মধ্যে অন্যটাকে ঢোকানো যায় (ছবি নং ৩ ক)। দুটো কৌটোরই পিছন দিক কেটে দু-মুখ খোলা ফাঁপা

চোঙের মত করি। পিচ বোর্ডের রিং তৈরি করে নিয়ে (ছবি নং ২) বাইরে কৌটোর এক প্রান্তে একটা ও অন্যটাতে দু-টো লেন্স শক্ত করে বসিয়ে দিই।

এই বার বাইরের কৌটোর দুইপ্রান্তে দু-টো L আকৃতির লোহার ক্ল্যাম্প ঠিক ব্যাস বরাবর নাট-বোল্ট দিয়ে লাগাই।
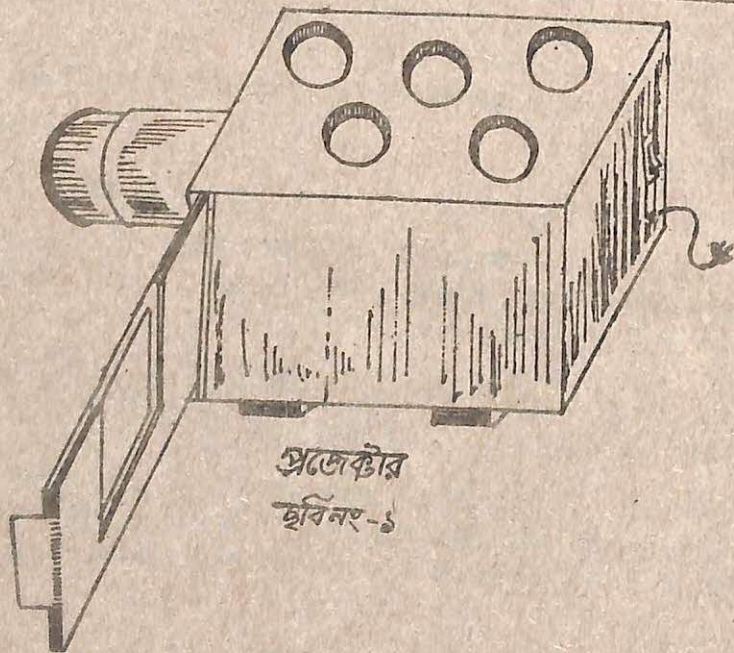
প্রজেক্টার
ছবিনং-১

প্লাই-উড দিয়ে প্রোজেকটারের খোলটা মাপসই করে তৈরি করে নিই (ছবি নং ৩ ক)। প্রয়োজনে অ্যালুমিনিয়ামেরই করা যেতে পারে। ঐ খোলটার পেছনের

দেওয়ালে লাগাই একশ ওয়াটের ঘরে ব্যবহারের সাদা ল্যাম্প, অফ-অন সুইচ। ল্যাম্পের তার মেনে দিই মাঝে সুইচ ঘুরিয়ে (ছবি ৩ খ)।
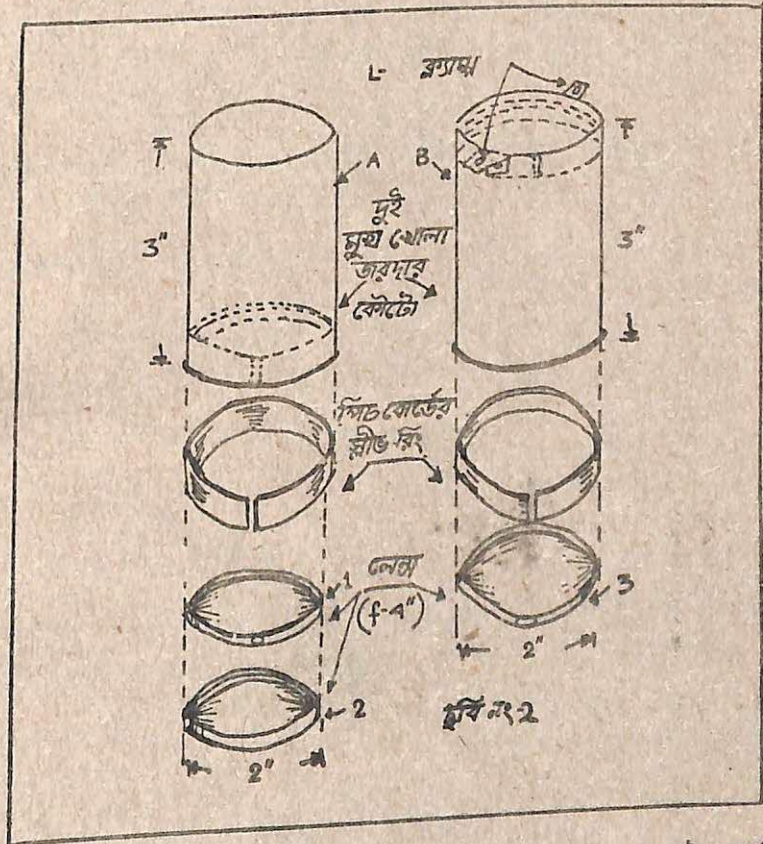
ওপরের ঢাকনাটা লাগাই কব্জা দিয়ে। তাতে থাকবে ৪-৫টা গর্ত। তাপ বেরোনোর জন্যে।

৪ক, ৪খ, ৪গ ছবির মত করে স্লাইড মুভারটা তৈরি করে নিই।
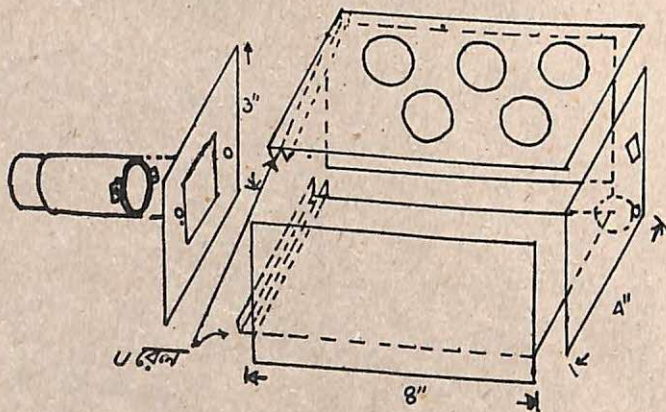
ছবি নং ৩(ক)
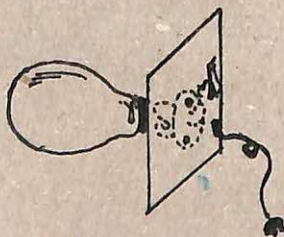
ছবি নং ৩(খ)
বাক্সের পেছনের দেওয়ালে লাগান
বাল্ব ও সুইচ

দু-টো 'U' আকৃতির স্লাইডারকে (৩ক নং ছবি) কাজে লাগাই স্লাইড মুভারে রাখা স্লাইডকে পাল্টাতে।

প্রোজেকটারের সামনে L লাগানো কৌটো যত্ন করে জায়গা মত লাগাই এবং গায়ে লাগানো L ক্ল্যাম্প প্রজেকটারের গায়ে নাট বোল্ট দিয়ে (ছবি ৩ক) বসিয়ে দিই বেশ শক্ত করে যাতে সহজে না নড়ে।

এখন ল্যাম্পটা জেবলে দিলে আলো স্লাইডের মধ্যে দিয়ে লেন্স হয়ে পর্দায় পড়বে ফলে স্লাইডের ছবি বড় হয়ে দেখা যাবে পর্দায়।

প্রজেকটার রেডি (ছবি নং ৫-এর মত)......

স্লাইডারের মধ্যে ভরে দি পুরনো স্লাইড—ফেলি পর্দায়।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি পায়ে চলা পুরনো রাস্তায়—

পুরোন সে তো নতুন যখন, আরও নতুন।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

লেন্সগুলো খেলনার দোকানে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নামে বিক্রি হয়। শুধু হাতল কেটে দেবে, চারধারে রিং যেমন থাকে থাকবে, ফলে কাজ অনেক কমে যাবে।

পিচবোর্ডের রিং তৈরির জন্য লাগবে একটা জুতোর বাক্সের পিচবোর্ড। এক ইঞ্চি মত চওড়া কেটে গোল করে ছবি নং ২-এর মত চোঙগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এতে লেন্সগুলো বেশ ভালভাবে এঁটে বসবে।

L ক্ল্যাম্প পাবে Hardwar (হার্ডওয়ার) দোকানে। সাইজ ½" ॥

ল্যাম্প হোল্ডার হবে বেস টাইপ (Base type), কারণ মাপ সেইমত দেওয়া আছে ॥

ছবি নং. ৪(ক)
1"
1"
1¾"
1¾"
1½"
1½"
③
2"
2"
2"
2"
②
1½"
1½"
1½"
1½"
৪"
3
2
1
①
ছবি নং. ৪(খ)
স্লাইড কভার
ছবি নং ৪(গ)
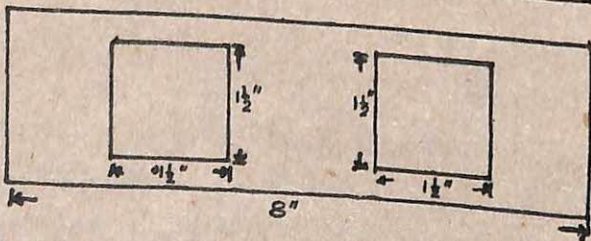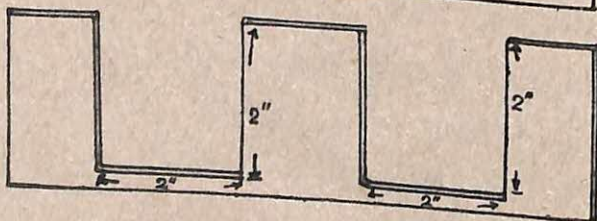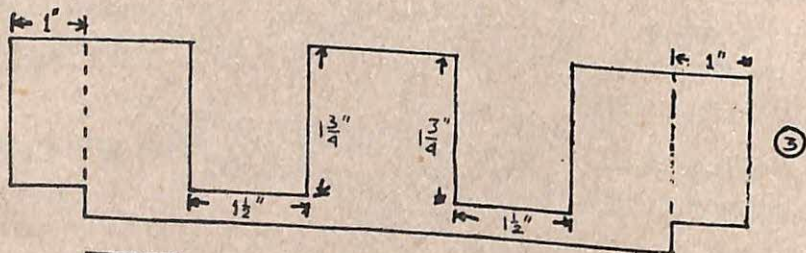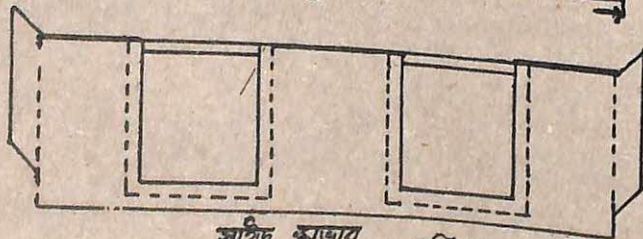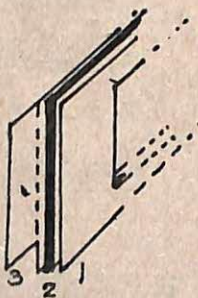
স্লাইড মুভার কার্ডবোর্ডের বদলে অ্যালমুনিয়াম হলে টেঁকসই হবে। তখন স্লাইউড আর অ্যালুমিনিয়াম প্লেট দুটো (৪ নং ছবি) রিবেট করে দেবে।

দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা বলি।

প্রথমতঃ, প্রোজেকটার চলাকালীন একটা একটা Table fan ব্যবহার করো, না হলে স্লাইড গরম হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, স্লাইডের জন্য বিশেষ ধরনের ফিল্ম বাজারে পাওয়া যায়।
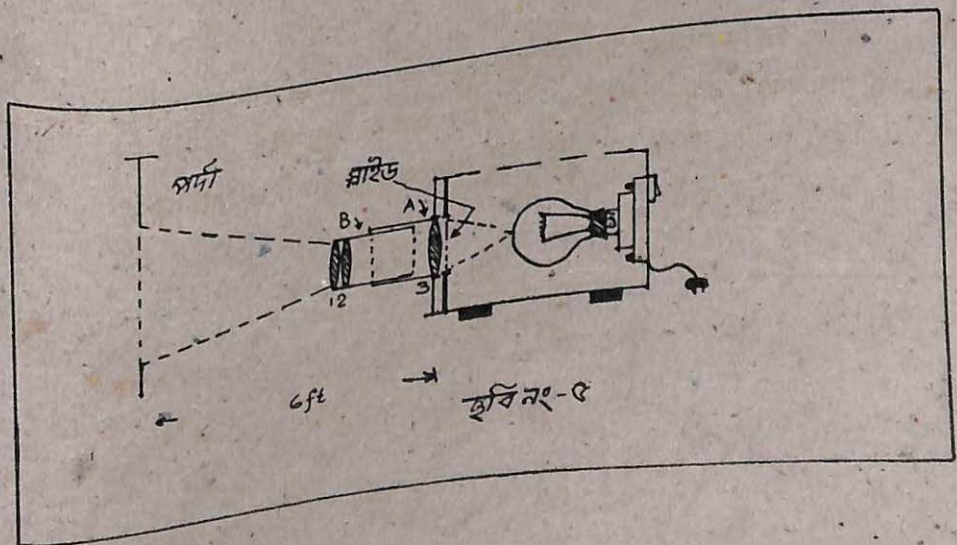
পাতে চাটনি পড়ে গেছে। মন তাই ভার ভার। এবারে উঠতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিনিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে আর বেশি কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দই—না, থাক্ শেষপাতে আইসক্রীম দিয়েই শেষ করি!

কি কি লাগবে ঃ

রেজিস্ট্যান্স ঃ
R—3 meg /½ W চারটি।
R_1—470K /½ W একটি।

কন্ডেনসার ঃ
C—0.1 μ fd 200V চারটি।
C_1—5 μ fd 500V একটি।

ডায়োড ঃ
D—1 N 35 or DR 25 চারটি।
D_1—BY 125 একটি।

এছাড়া—
Ne—Neon Lamp তিনটি।
SP—Push on Switch একটি।
L—6.3V miniature Lamp চারটি।
T—Stepdown transformer
Pri-230V/Sec-6.3V, একটি।
Sm—Mains' Switch (SPST), একটি।
P—Phone Jack (socket), একটি।
J—Jack Pin (base), দশটি।

প্লাই উড বা কার্ডবোর্ড ঃ সাইজ 7″×5″ একটি।
2″×7″ দুইটি।
2″×5″ দুইটি।

কিছু রঙিন সেলোফেন পেপার, আঠা, পেরেক, রঙ, তুলি ইত্যাদি।
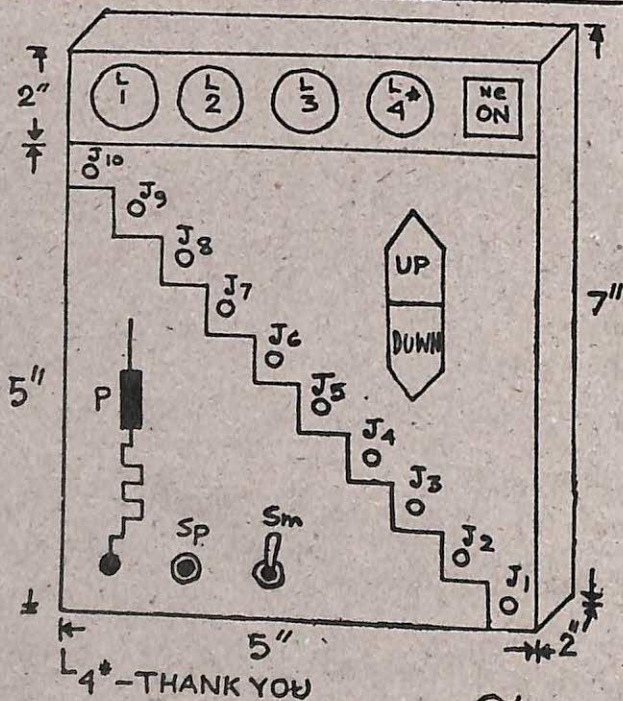
ছবি নং-১

ছবি নং-২

সামনের বোর্ডের লে-আউট
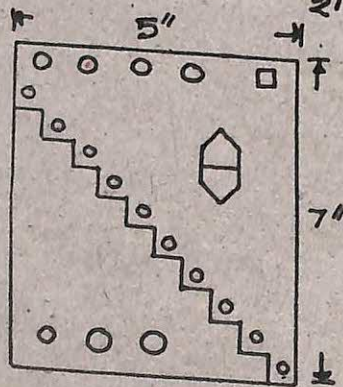
কেমন করে বানাবে ঃ

এক ॥ ছবি নম্বর ১ দেখ। এর জন্যে মাপ দেওয়া কার্ডবোর্ড/প্লাইউডের বাক্স বানাও।

দুই ॥ ছবি নম্বর ২-এর মত করে সামনের প্যানেলে বোর্ডটাতে গর্তগুলো কেটে নাও।

তিন ॥ সার্কিটে হাত দাও। দেখ, ছবি নম্বর ৩-এ একটি ডট্ লাইন ঘেরা সার্কিট আছে। এই সার্কিট বাজারে ইলেকট্রনিক টসার (Tosser) নামে বিক্রি হয়। কিনেও নিতে পার, তবে তখন Ne_1 ও Ne_2 নিয়ন ল্যাম্পদুটো "up & down" লেখা গর্তে বসাবে। হাতে তৈরি করলে যন্ত্রাংশগুলো কিনতে হবে। আবার ইচ্ছে করলে খরচ কমাবার জন্যে যেকোন পয়সা দিয়ে 'টস্' করে up বা down ঠিক করতে পারো। ডট্ঘেরা অংশের বাইরে সার্কিটটা খুবই সহজ।

ল্যাম্প চারটেকে (L_1—L_4) পরপর গর্তে বসাও। Ne লেখা নিয়নটা On লেখা গর্তে বসাবে। গর্তগুলো এবার রঙিন সেলোফেন পেপারে মুড়ে দাও।

চার ॥ ১, ২, ৩, ৪,......লেখা গর্তগুলোতে সাইজমত করে বেসপিন (J) লাগাও। এদের থেকে একটা করে তার বার করে (৩নং ছবির মত) ঠিকমত বেছে ল্যাম্প-গুলোকে সিরিজে লাগাও। ল্যাম্প (L_1—L_4)-গুলোর অন্য পোল একসাথে জুড়ে একটা তার বার করো, যেটা ট্রান্সফর্মারের A পয়েন্টে যাবে। B পয়েন্ট থেকে একটা তারে জ্যাকপিন "P" থাকবে। ট্রান্সফরমারের বাকি (উল্টোদিকের) পোলদুটোতে Ne নিয়ন সমান্তরালে শ্রেণীতে লাগাবে। আর মেনের জন্যে তারটা সুইচ (Sm) সিরিজে রেখে বার কর।

পাঁচ ॥ প্রয়োজন হলে জ্যাকপিনগুলোর (J_1—J_9) সঙ্গে ল্যাম্পের (L_1—L_3) কানেকশনগুলো পাল্টাপাল্টি করে নিতে পারো। L_4-এর সঙ্গে J_{10} সবসময় থাকবে।

ছয় ॥ L_4-ল্যাম্পের গর্তের উপর THANK YOU লিখে দেবে। এতে যন্ত্রটা দেখতে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

P
5m
B
T
J1 J4 J7
J3 J6 J8
J5 J2 J9
J10
BASE
PIN
A.C.
230v
Ne
L
1
L
2
L
3
L4/
THANK YOU
A
C1
R1
R
R
D
C
C
D
SP
D
D
UP
Ne1
DOWN
Ne2
D1
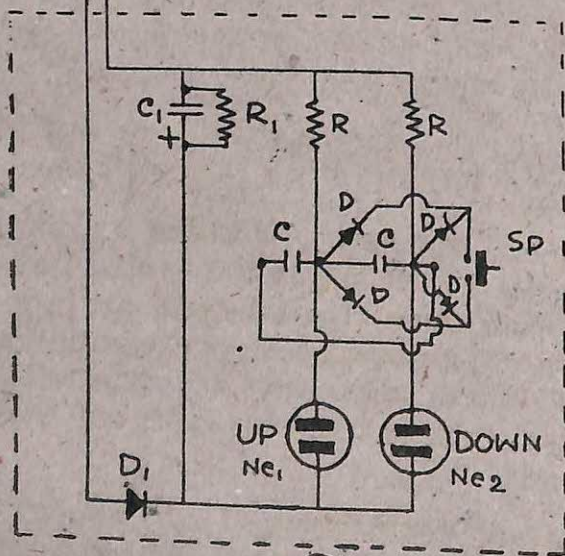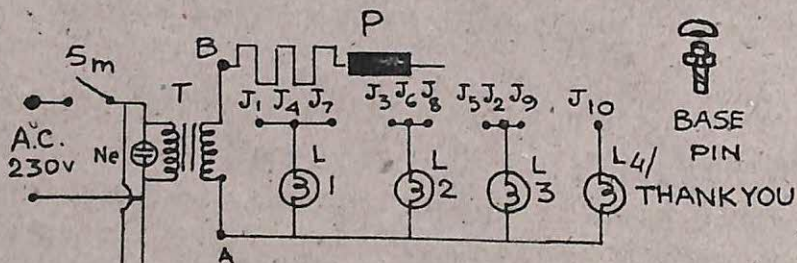
ছবি নং-৩

কেমনভাবে খেলবে ঃ

এক ॥ Sm ON কর। দেখবে Ne জ্বললো।

দুই ॥ জ্যাকপিন্ (P) J_1-এ ঢোকাও। দেখবে L_1 জ্বললো।

তিন ॥ এবার Sp টিপে কিছুক্ষণ (৫-১০ সেকেন্ড) রেখে ছেড়ে দাও। দেখবে up/down লেখা তীরদুটো কিছুবার জ্বলা-নেভা করার পর যেকোনো একটা জ্বলে থাকবে। যদি up জ্বলে, তলে L_1 জ্বলেছে বলে একঘর ওপরে ওঠো। অর্থাৎ জ্যাকপিন J_2 লেখা ঘরে ঢোকাও। দেখবে, L_3 জ্বললো।

চার ॥ তিন নম্বর প্রক্রিয়া আবার করো। যদি up জ্বলে, তবে তিনঘর ওপরে অর্থাৎ J_5-এ জ্যাকপিন যাবে।

পাঁচ ॥ যদি DOWN জ্বলে তবে J_1 ঘরে জ্যাকপিন নেমে আসবে।

ছয় ॥ এইভাবে ওপরের দিকে অর্থাৎ J_{10}-এর দিকে এগোতে থাকো।

সাত ॥ ধর, এখন খেলোয়াড় J_9-এ এসে পেঁছেছে। এবার up জ্বললে খেলার নিয়ম অনুযায়ী তিনঘর ওঠার কথা। কিন্তু উঠতে বাকি আর একঘর। তাই আবার নিচে নেমে দশ-এ পেঁছোনোর চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু নামবার সময় যত-ঘর নামার দরকার, তার চেয়ে কম ঘর বাকি থাকলেও সেই কয় ঘরই নামবে।

আট ॥ যদি তিন নম্বর ছবির ডট্ দেওয়া ঘরের সার্কিটটা না কর, তবে টসে ঠিক কর 'হেড' পড়লে up আর 'টেল'-এ down বা উল্টোটা।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ

ল্যাম্পগুলোয় ম্যাচিং করে এমন ভোল্টেজের ট্রান্সফরমার ব্যবহার করবে, যদি ল্যাম্প 6 ভোল্টের হয়, তবে ট্রান্সফরমারও 6 ভোল্টের নেবে।

ইচ্ছে করলে ব্যাটারিও ব্যবহার করতে পারো।

টসারের সার্কিটটা মনে করলে বাদ দিতে পারো। তাতে খরচ অনেক কমে যাবে, কমে যাবে বাড়তি ঝুটঝামেলাও।

টুকিটাকি

বই পড়া তো শেষ। এবার কাজে লেগে পড়ার পালা। কিন্তু মুশকিল বাধল যন্ত্রপাতিগুলো কিনে আনার পর।

রেজিস্ট্যান্সগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কতমানের, বোঝা বেশ শক্ত। লিভারটা তৈরি করে আলম্ব বিন্দুর জায়গাটা ঠিক করা, কিংবা ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে, নতুন নতুন ঠেকছে, এইসব আর কি।

ঝটপট এইসব খুচরো ঝামেলাগুলো মিটিয়ে নিলেই বোধহয় ভাল। তাই না?

এসো তবে সংক্ষেপে এক এক করেই শুরু করি।

এক॥ রেজিস্টান্স বা রোধ (*Resistance*) :

কোনো বৈদ্যুতিক পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের সময় পরিবাহী যে বাধা দেয়, তারই বৈজ্ঞানিক নাম রোধ বা রেজিস্টান্স। এর একক বা মাপকাটি হলো 'Ohm' Ω।

বাজারে চলতি রোধগুলো সাধারণতঃ হয় কার্বনের। তার উপর শক্ত পুডিং-এর মোড়ক দিয়ে ঢাকা।

রোধের মান বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এক বিশেষ পদ্ধতি, নাম—কালার কোড্ (Colour cod)। দেখবে, রোধগুলোতে লাল, কালো, কমলা, বাদামী ইত্যাদি নানা রঙের সরু সরু দাগ টানা থাকে পরপর তিনটে (চার্ট নং ১-এর ক, খ ও গ দাগ) আর দূরে আর একটা (ঘ দাগ)।

নিচের চার্ট নং ১ তোমাদের সাহায্য করবে রোধের মান নির্ণয়ের জন্য।

রঙ	ক ১ম সংখ্যা	খ ২য় সংখ্যা	গ ৩য় সংখ্যা (গুণিতক)	ঘ টলারেন্স
কালো	থাকে না	০	১	± ১%
বাদামী	১	১	১০	± ২%
লাল	২	২	১০০	থাকে না
কমলা	৩	৩	১,০০০	থাকে না
হলুদ	৪	৪	১০,০০০	”
সবুজ	৫	৫	১,০০ ০০০	”
নীল	৬	৬	১০,০০,০০০	”
বেগুনি	৭	৭	থাকে না	”
ধূসর	৮	৮	থাকে না	”
সাদা	৯	৯	থাকে না	”
সোনালী	থাকে না	থাকে না	০.১	± ৫%
রুপোলী	থাকে না	থাকে না	০.০১	± ১০%

‘খ’তে অন্য কোন রঙ থাকলে ± ২০% টলারেন্স বুঝতে হবে।

K Ω = 1 X 1000 Ω ; Meg Ω = 1 X 10,00,000

চার্ট নং ১

তবে আরো সহজ করবার জন্য এই বইতে ব্যবহৃত রোধগুলির কালার রেকোর্ডের চার্ট দিলাম (চার্ট নং ২)।

রোধের মান / রঙ	প্রথম ক	দ্বিতীয় খ	তৃতীয় গ	চতুর্থ (দূরের) ঘ
10 Ω	বাদামী	কালো	কালো	কালো । বাদামী
1 K Ω	বাদামী	কালো	লাল	সোনালী । রুপোলী
2 K Ω	লাল	কালো	লাল	"
86 K Ω	নীল	ধূসর	কমলা	"
220 K Ω	লাল	লাল	হলুদ	"
470 K Ω	হলুদ	বেগুনী	হলুদ	"
3 Meg Ω	কমলা	কালো	সবুজ	"

চার্ট নং ২

নিজে করো

দুই ॥ লিভার (*Lever*)

বল কমানো বা বাড়ানোর এক বিশেষ ব্যবস্থাকে বলি লিভার। কাজের প্রকার-ভেদে এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন, প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণী। এইসব শ্রেণীর পার্থক্য শুধু বল প্রয়োগ, আলম্ব বিন্দু আর বাধার পরিবর্তনে।

এই বইতেই 'অটো-স্টার্ট রেডিও' তৈরির সময়ই লিভারের কার্যকারিতা তোমরা দেখেছো। লিভারটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এখানে আলম্ব বিন্দু মাঝে আর বড় বাহুতে অ্যালার্ম ক্লকের চাবি। কাজেই সামান্য ঠেলা লাগলেই ছোট বাহুর নিচের পুশ সুইচে যে বল পড়বে, তাই যথেষ্ট সুইচ অন্‌ করতে।

তিন ॥ ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেট বা বৈদ্যুতিক চুম্বক (*Electromagnet*) :

বলতে গেলে, স্বনামধন্য বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ম্যাজিকের মত এক জব্বর জিনিস উপহার দিয়ে গেছেন।

তিনি করেছিলেন কি, একটা সরু এনামেল করা তারকে আচ্ছা করে পাকিয়ে-ছিলেন একটা লোহার টুকরোর গায়ে। তারপর চালু করেছিলেন বিদ্যুৎ প্রবাহ, ঐ তারের মধ্য দিয়ে।

শুরু হয়ে গেল ম্যাজিক। ছিল লোহা, হলো চুম্বক! এ যেন বিজ্ঞানের হ-য-ব-র-ল!

পরিবাহীর কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে ঐ কুণ্ডলীতে চুম্বকের ধর্ম দেখা দেবে। প্রবাহ বন্ধ করলেই চৌম্বকত্ব খতম! একেই বলে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেট বা বৈদ্যুতিক চুম্বক।

তোমরা তৈরি করার সময় একটা পোস্টকার্ড কেটে সাইজমত চোঙ. করে নেবে। তার ওপর জড়াবে, এনামেলের তার। এই চোঙের ভেতরে থাকবে লোহার বোল্ট, যেটা হবে ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটাইজ্‌ড্‌ বা বৈদ্যুতিক চুম্বক-প্রাপ্ত।

ব্যস, আমাদের খেল খতম! এবারের মত ছুটি। তোমরা এগুলো বানাতে থাক ধীরেসুস্থে, আমরাও একটু জিরিয়ে নিই! কেমন ?

মাত্র ১৫-৪৫ টাকার মধ্যেই হাতেকলমে নানান বিচিত্র যন্ত্রের নির্মাণপ্রণালী! যেমন ইলেকট্রনিক গেম্‌স্‌, প্রোজেকটার, ইনস্ট্যাণ্ট কালার টিভি......এইরকম পুরো একডজন! সঙ্গে রয়েছে অজস্র নিখুঁত ছবি। আর রয়েছে প্রতিটি যন্ত্রের সহজসুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ। পুরো বইটাই লেখা হয়েছে সরস গল্পের মোড়কে, যাতে ক্লান্তি না আসে। অর্থাৎ একাধারে আনন্দ ও জ্ঞান, মণিকাঞ্চন সমাবেশ।

বিরাট এই দেশের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের বিজ্ঞানমুখী করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে তাদের আনন্দ দিতে পারে, তাদের কাছে এক অপূর্বসুন্দর নেশা হয়ে দাঁড়াতে পারে, এই ধারণাটাই তাদের মনে সর্বাগ্রে গড়ে তোলা প্রয়োজন। ঠিক সেই কথা স্মরণে রেখেই এই বইয়ের প্রকাশ। নিঃসন্দেহে এ বই বাড়িতে রাখতেই হবে।